মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR
রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-১, সংখ্যা-৭

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

আগস্ট ২০১২ইং, রমাজান ১৪৩৩হি:

رمضان المبارك ١٤٣٣هـ، اغسطس ٢٠١٢م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাও: নাসির উদ্দীন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

প্রচ্ছদ : মারকায কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আশরাফিয়া মাদরাসা গাজীপুরের জামে মসজিদ।

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা - ১০,০০০(দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েভ :http://monthlyalabrar.wordpress.com/

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৫
পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৭
দরসে ফিক্বহ ১০
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদুয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ১৪
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মালফূযাতে ফকীহুল মিল্লাত ১৫
মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ........ ১৭
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
কোয়ান্টাম মেথড-৪........ ২০
মুফতী শরীফুল আজম
ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও করণীয় ২৪
মুফতী জাফর আলম আনওয়ার কাসেমী
উপমহাদেশে কুরআনে করীমের অনুবাদ........ ২৬
মাওলানা কাজী ফজলুল করীম
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)........ ২৮
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩০
শবে ক্বদর ও ই'তিকাফের তাৎপর্য ৩৪
রিজওয়ান জমীরাবাদী
প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি-২........ ৩৮
মাওলানা হুযায়ফা দস্তানভী
উদীয়মান কাফেলা ৪১
খবরাখবর ৪৪

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাহে রমাজান – আমাদের করণীয়

পবিত্র মাহে রমজানে আমাদের করণীয় শীর্ষক হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বারাকাতাহুমের একটি দিক নির্দেশনামূলক অমূল্য বয়ান এবার সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশ করা হলো।

(আবরার পরিবার)

বর্তমান পৃথিবীর সার্বিক পরিবেশ যেহেতু পাপ পঙ্কিলতা ও গোনাহের উপকরণে পরিপূর্ণ, তদুপরি শয়তানের সার্বক্ষণিক চেষ্টা হলো মুসলমানদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, সেহেতু মুসলমানগণ পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, নাফস এবং শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ে। অনেক গোনাহ ও পাপকর্ম তার দ্বারা সাধিত হয়। যুক্তি ও নীতি অনুযায়ী তো কুরআনের ঘোষণা وهديناه النجدين "আমি তাদেরকে দুটি রাস্তাই চিহ্নিত করে দিয়েছি" মতে যারা পাপে লিপ্ত তাদের সাজা হওয়া এবং যারা উত্তম কাজে লিপ্ত তাদের প্রতিদানই দেওয়ার কথা। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ তা'আলার রহমতের চাহিদা হলো যারা উত্তম কাজ করে তারা তো প্রতিদান পাবেই, এমনকি যারা পাপ কাজে লিপ্ত তারাও পাপ থেকে মুক্তি ও পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়ার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া। যাতে সে নিজ গোনাহের পাহাড় ডিঙিয়ে জান্নাত লাভের যোগ্য হয় এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আপন প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতকে মাহে রমাজান এবং রোযা দান করেছেন। নিশ্চয়ই মাহে রমাজান এবং এই মাসের ইবাদতসমূহ আল্লাহর রহমত, মাগফেরাত অর্জন করা এবং গোনাহের বোঝাকে হালকা করার উন্নত পাথেয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ﷺ "اعطيت امتى خمس خصال فى رمضان لم تعطهن امة قبلهم، خلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عزوجل كل يوم جنته، ثم يقول : يوشك عبادى الصالحون ان يلقوا عنهم المؤمنة او يصيروا اليك وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصوا فيه الى ماكانوا يخلصون اليه فى غيره ويغفر لهم فى آخر ليلة، قيل يارسول الله! اهى ليلة القدر؟ قال لا ! ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله"

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ননা করেন যে, আমার উম্মতকে রমাজান শরীফের জন্য পাঁচটি বস্তু বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতগুলো প্রাপ্ত হয়নি। (১) রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে মেশ্‌ক থেকেও বেশি পছন্দনীয়, (২) তাদের জন্য সাগরের মাছও ইফতার করা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে, (৩) জান্নাতকে তাদের জন্য প্রতিদিন সজ্জিত করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, অত্যাসন্ন, আমার নেক বান্দাগণ পার্থিব কষ্ট-মেহনত নিজের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে তোমার কাছে আসবে, (৪) এর মধ্যে অভিশপ্ত শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয় যাতে তারা ওই সকল পাপের দিকে পৌঁছতে না পারে যেগুলোর কাছে অন্য সময় তারা পৌঁছতে পারত, (৫) রমাজানের শেষ রাত্রে রোযাদারদের ক্ষমা করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ক্ষমার রাত্র কি শবে কদর? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না, বরং নিয়মিত, শ্রমিকদেরকে তাদের কাজ শেষ করার পর পরই পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হয়।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ২/৫৫, মুসনাদে আহমদ ২/২৯২)

সুতরাং বোঝা যায়, নিঃসন্দেহে রমাজানুল মোবারক এবং এই মাসের ইবাদতসমূহ মুসলমানদের সারা বছরের গোনাহ এবং গোনাহের বোঝা মিটিয়ে দেওয়ার একটি উত্তম মাধ্যম। এই মাসের প্রতিটি ক্ষণের বরকতসমূহ মানুষের গোনাহের ঘনত্বকে কিভাবে পরিষ্কার করে? তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই হাদীসে–

عن ابى هريرة رض قال: قال رسول الله ﷺ : من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه (مشكوة ١٧٣)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে লোক ঈমান এবং ছাওয়াবের নিয়্যাতে রমাজান শরীফের রোযা রাখে, তার পেছনের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে লোক ঈমান ও ইখলাসের সাথে রমাজান মাসে ইবাদত করে, তার অতীতের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমান ও ইখলাসের সাথে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে তার অতীতের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।"

বোঝা যায় রমাজান এবং এর ইবাদতসমূহ মানুষের পুরো বছর, বরং পুরো জীবনের গোনাহ থেকে মুক্তির কারণ। অন্য ভাষায় বলা যায়, যারা সারা বছর, সারা জীবন শয়তানের ধোঁকায় নিপতিত হয়ে গোনাহ এবং পাপকর্ম করে নিজের ওপর প্রচণ্ড জুলুম ও অত্যাচার করেছে, তাদের প্রতি রমাজান প্রতিবছরই আহবান জানাচ্ছে– بازآ بازآ هرآنچه هستی بازآ "ফিরে আসো,

ফিরে আসো, যেথায় আছ যেভাবেই আছ ফিরে আসো" নিরাশ ও নৈরাশ্যের কোনোই কারণ নেই, রহমতের সাগরধারা তরঙ্গ লীলায় মেতে উঠেছে, তাতে প্রক্ষালণ করে নিজের গোনাহের যাবতীয় আবর্জনা পরিষ্কার করে পূনরায় আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের কাতারে শামিল হয়ে যাও।

এ কারণেই রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাহে রমাজানকে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং উম্মতকে রমাজানের গুরুত্বের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। যেমন হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, শা'বান মাসের শেষ তারিখ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বারে সমাসীন হলেন এবং ইরশাদ করলেন –

"হে লোক সকল! তোমাদের মাঝে এমন একটি বড় ও বরকতময় মাসের আগমন ঘটছে, যে মাসে এমন একটি রাত (শবে ক্বদর) আছে যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম (এ রাতের ইবাদতের ছাওয়াব এক হাজার মাসের ইবাদত থেকেও বেশি) আল্লাহ তা'আলা এই মাসের দিবসসমূহের রোযাকে ফরজ এবং রাতের ইবাদতকে নফল করেছেন। এই মাসে যে লোক একটি আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইবে, তার জন্য সে আমল অন্য মাসের ফরজ আমলের সমতুল্য হবে (নফল কাজে ফরজের ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে)। যে লোক একটি ফরজ আমল আদায় করবে তা অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায়ের সমতুল্য হবে। হে লোকসকল! এ মাস সবর তথা সংযমের মাস এবং সবরের ছাওয়াব ও প্রতিদান জান্নাত। এটি মানুষের মধ্যে পরস্পর সহমর্মিতা-সম্প্রীতি ও কল্যাণকামিতার মাস, এই মাসে মুমিনের রিযিক প্রশস্ত করা হয়, যে লোক এই বরকতময় মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা প্রাপ্ত হয়, রোযাদারের ছাওয়াবে কোনো প্রকার হ্রাস করা ছাড়া ইফতারের ব্যবস্থাকারী ব্যক্তিকে তার সমপরিমাণ ছাওয়াব দেওয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে তো প্রত্যেকে এমন ক্ষমতা রাখে না যে, অন্যকে নিয়মিত ইফতার করাবে এবং এর ছাওয়াব অর্জন করবে। (নবী-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর অকপট বন্ধু সাহাবায়ে কেরামকে এমন উত্তর প্রদান করলেন যার মাধ্যমে তাদের নৈরাশ্য খুশিতে রূপান্তরিত হয়েছে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই পরিমাণ ছাওয়াব প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও দান করবেন যে রোযাদারকে এক ঢোক দুধ পান করাবে, একটি মাত্র খেজুর খাওয়াবে, এমনকি এক ঢোক পানি পান করিয়েও যদি ইফতার করিয়ে দেয়। হ্যাঁ যে লোক রোযাদারকে পেট পুরে খাওয়াবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসে আমার হাউজে কাউছার থেকে এমন পানি পান করাবেন যার কারণে তার আর কোনো সময় পিপাসা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ না করে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, এটি এমন একটি মাস, যার প্রথম দশ দিন রহমতের, মাঝের দশ দিন মাগফেরাত তথা গোনাহ মার্জনার এবং শেষ দশ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির। যে লোক এই মাসে নিজের দাস (বৃত্ত, খাদেম, অধীনস্ত চাকরীজীবিপ্রমুখ)-এর বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। হে লোক সকল! এই মাসে চারটি আমল বেশি বেশি করো–১. কালিমায়ে তায়্যিবার যিকির, ২. ইস্তিগফার, ৩. জান্নাতের দু'আ এবং ৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ। (মিশকাত ১/১৭৪, বায়হাকী শু'আবে ঈমান ৩/৩০৫)

পবিত্র মাহে রমাজানের এহেন অসাধারণ ফজীলত অর্জন এবং রমাজান মাসের পুরোপুরি হক আদায় হওয়ার জন্য আমাদের আকাবিরগণ এই মাসে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আমল, ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মেহনতে মনোনিবেশ করতেন। নিজের ইবাদত, প্রতিবেশীদের আমল-ইবাদত এবং ছাত্র ও মুরিদগণের আমল ইবাদতকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করার জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থাও অবলম্বন করতেন এবং দিকনির্দেশনা দিতেন।

আমাদের মুরশিদ মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)ও রমাজান মাসে বর্তমানে মুসলমানদের কী কী আমলের প্রতি বেশি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, কোন কোন কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে এরূপ দিকনির্দেশনামূলক বয়ান দিতেন। আবার নিজের খানকাহে আগতদেরকে এগুলোর বাস্তব প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁর দিকনির্দেশনায় যা থাকত তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

১. কালিমায়ে তায়্যিবা বেশি বেশি পাঠ করা।
২. ইস্তিগফার অধিক হারে পড়া।
৩. জান্নাতের জন্য দু'আ করা।
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ করা।
৫. যতটুকু সম্ভব বেশি বেশি কুরআনের তেলাওয়াত করা, দরুদ শরীফ কমপক্ষে তিনশত বার বা তার চেয়ে বেশি যতবার সম্ভব পাঠ করা।
৬. তাকবীরে উলার সাথে জামা'আতের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া।
৭. তারাবীহের জন্য এশার জাম'আতের আগে উপস্থিত হওয়া।
৮. অবসর সময়ে ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করা।
৯. যথাসম্ভব দান-সদ্কা করা।
১০. অনর্থক কথা-বার্তা থেকে বেচে থাকা, অতীব প্রয়োজন ছাড়া পার্থিব কথা না বলা।
১১. সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা। বিশেষ করে বদ নজরী, গীবত, জুয়া, লটারি, টিভি, রেডিও, মোবাইল এবং ইন্টারনেট, শরয়ী পর্দা না করা, গালগালাজ, ঝগড়া ফ্যাসাদ, দাড়ি চাঁছা বা এক মোট থেকে কম দাড়ি রাখা, দাড়ি ছাঁটা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা। এসব গোনাহ থেকে মুক্ত না হলে আল্লাহর কাছে উক্ত গোনাহসম্বলিত রোযার কোনো মূল্য নেই। এরূপ রোযার মাধ্যমে রোযার মূল লাভ ও পুরস্কার অর্জন করা

যাবে না। হাদীস শরীফে আছে "রোযা জাহান্নামের ঢালস্বরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঢাল বিদীর্ণ করা না হয়। ঢাল বিদীর্ণ করার অর্থ হলো গোনাহে জড়িয়ে পড়া। (মিশ্কাত শরীফ)

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, মানুষের জীবনে পানাহার একটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু রোযাতে তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আবার আল্লাহর হুকুম পালনার্থে নিজেদের অনেক অভ্যাস বিড়ি, সিগারেট, পান, হুক্কা, তামাক সবই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এসব করা হচ্ছে রোযার বরকত ও লাভ অর্জনের জন্য। সুতরাং যে সকল আচরণ ও কথাবার্তা নিষিদ্ধ এবং পরিহারযোগ্য রোযা রেখে তা পালন করা কতই না অসঙ্গত ও অশ্রেয় তা চিন্তা করা প্রয়োজন। হাদীস শরীফে আছে–

من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابه (مشكوةشريف)

"যে লোক গোনাহযুক্ত কথা ও কাজ রোযার মধ্যে পরিহার করবে না, তবে তার পানাহার ছেড়ে দেওয়া আল্লাহর কাছে কোনোই কদর নেই।"

জটিল থেকে জটিল কাজ সৎসাহসের মাধ্যমে সাধিত হয়। এরূপ অসঙ্গত কাজ ও কথাও যদি পরিহারের সাহস করা হয় এবং মনযোগ দেওয়া হয়, ছাড়া যাবে ইনশাআল্লাহ। যেমন :

ক. এই রোযাতেই শরীয়ত মোতাবেক দাড়ি রাখার মনস্ত করা যায়। শরীয়ত অনুযায়ী দাড়ি রাখার পর আয়নায় নিজের চেহারা দেখলে কতো নূরানি মনে হবে! এটি তো এমন গোনাহ, যা সর্বক্ষণ হতে থাকে। চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কবিরা গোনাহ সংঘটিত হওয়ার পর আর কেউ তা জানে না। কিন্তু শরীয়ত অনুযায়ী দাড়ি না থাকলে নামায, রোযা, হজ্ব প্রত্যেক অবস্থায় একজন দোষী হিসেবে থাকতে হয় এবং আল্লাহর খাস রহমত থেকে মাহরূম হয়।

খ. শরয়ী পর্দার অর্থ হলো যারা মুহরিম না তাদের প্রত্যেকের সাথে শরীয়ত মতে পর্দা করা। শরীয়ত অনুযায়ী অনেকে মুহরিম না তার পরেও আমাদের প্রায় ক্ষেত্রে তাদের সাথে পর্দা করা হয় না। যেমন– ১. ভাইয়ের স্ত্রী ২. স্ত্রীর বোন, ৩. মামত বোন, ফুফাত বোন, খালাত বোন, চাচাত বোন প্রমুখ। ৪.মামি ৫. চাচি। মহিলাদের জন্য ১. ভগ্নীপতি, ২. স্বামীর ভাই ৩. খালাত, মামাত, চাচাত, ফুফাত ভাই ৪. খালু, ফুফা।

গ. গীবত বা পরের সমালোচনা থেকো বেঁচে থাকার প্রতি বেশি বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বেশির ভাগ লোক গীবতের কারণে নিজের রোযাকে অজান্তে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।

ঘ. বদনজরী থেকে বাঁচার জন্য খুবই গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এটি শয়তানের বিষাক্ত তীর। এর মাধ্যমে ইবাদতের নূর চলে যায়।

একজন মুসলমান পবিত্র রমাজান মাসকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর জন্য এবং রমাজানের সুফল ভোগ করতে পারার জন্য হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর এহেন নির্দেশনা মতে পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

এই দিকনির্দেশনায় যেমন আলেম উলামাদের এবং মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণীয় ও পালনীয় বিষয়াদি রয়েছে তেমনি জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত, সুধী সমাজ, কর্মকর্তা, কর্মজীবী, শ্রমজীবী এবং আম জনসাধারণ তথা সর্বস্তরের লোকদের জন্যও পথনির্দেশ রয়েছে।

আমাদের আকাবিরগণ কিভাবে মাহে রমাজানের গুরুত্ব দিতেন, মূল্যায়ন করতেন এবং এই বরকতময় মাসে ঘোষিত ফাজায়েল অর্জনের জন্য কিরূপে মেহনত, মুশাক্কত ও কঠোর পরিশ্রম করতেন তা জ্ঞাতির জন্য শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) কর্তৃক রচিত "আকাবের কা রমাজান" কিতাবটি পড়া যেতে পারে।

বেশ কিছু উলামায়েকেরাম, মাদরাসার জিম্মাদার, মুহাদ্দিস, মুফাসসির এবং আসাতিজা আমাদেরকে মুহাব্বত করে বিধায় রমাজান মাসের সময়টুকু কাটাতে আমাদের এই ছোট্ট পরিসর "বসুন্ধরা মারকায"-এ জমায়েত হন। আবার দ্বীনি ইলম পিপাসু দূরদূরান্তের বহু ছাত্রও এই জমায়েতে যোগ দিয়ে থাকে। আমরা তাঁদের যৎসামান্য খেদমত করার চেষ্টা করি। এক জমা'আত থাকে চল্লিশ দিনের ই'তিকাফকারী। আরেক জমাআত থাকে ৩০ দিন বা ১৫ দিনের ই'তিকাফকারী। আবার বিশ রমাজানের পর আশারায়ে আখীরার ই'তিকাফ কারীদের একটি জমা'আত হয়ে থাকে। আমরা তাদের জন্য বিভিন্ন ইসলাহী প্রশিক্ষণ ও বয়ানের ব্যবস্থা করে থাকি। ছাত্রদের জন্য তাসহীহে কুরআন, নাহু, সরফ এবং ফেরাকে বাতেলা সম্পর্কে সম্মক জ্ঞাতির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকি। আমাদের আসাতেজা, ছাত্রগণ মাশাআল্লাহ আত্মতৃপ্তির সাথে স্বেচ্ছায় তাদের খেদমত করে থাকেন। আমি তাঁদের শোকরিয়া আদায় করি।

আরেকটি কথা না বললেই নয়, আমাদের দেশে শুধু নয়, অন্য দেশেও মনে হয় ক্রমান্বয়ে রমাজানের চিত্র যেন পাল্টে যাচ্ছে। রমাজানের চাঁদ দৃশ্যমান হওয়ার পর পরই এক শ্রেণীর লোকের মাথায় যেন ঈদুল ফিতরের ইমেজই ছওয়ার হয়ে বসে। ব্যাপক হারে ঈদের বাজার, ঈদের কেনাকাটা নামে একটি সংস্কৃতি চালু হয়ে যায়। মনে হয় এগুলো রমাজানের এই বিশাল ফজীলত থেকে মাহরুম হওয়ারই একটি পন্থা। ব্যবসায়ী ভাইয়েরা মনে করেন পুরো বছরের জন্য এটি একটি মুখ্যম ব্যাবসায়িক সিজন। রমাজান মাসটি আসলে সিজন ঠিকই। কিন্তু এটি তো পার্থিব ব্যবসার সিজন নয় বরং এটি তো আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত, বরকত তথা উখরবী আয় ও ছাওয়াব অর্জনের সর্বোত্তম সিজন। আর ঈদ হলো আল্লাহর সাথে এই ব্যবসা করতে গিয়ে যে মেহনত ও শ্রম ব্যায়িত হয়েছে তার অবসাদ ঝেড়ে ফেলে যাবতীয় পাপমুক্ত হয়ে আরেকটি স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করার জন্য ট্র্যানজিট করতে গিয়ে আল্লাহর কাছে খুশি প্রকাশ করার মুখ্যম সময়। সুতরাং এই ধরনের চিন্তা ও অপসংস্কৃতি যেন আমাদের রমাজানকে নষ্ট করে না দেয় সে দিকে আমাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। ঈদের অজুহাতে রমাজান যেন আমাদের হাত ছাড়া হয়ে না যায়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان

"রমাজান মাস হলো সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথের যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।" (বাকারা আয়াত ১৮৫)

রমাজান মাসের ফজীলত ও মাহাত্ম্যের জন্য এটা কি কম হতে পারে যে মহান আল্লাহ রোযার মতো মোবারক আমলের জন্য এ মাসকে চয়ন ও নির্বাচন করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা, তাওরাত, ইঞ্জিলসহ সমস্ত আসমানি কিতাব রমাজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এবং পবিত্র কুরআন শরীফও রমাজান মাসে ২৪ তারিখ রাতে লাওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে সম্পূর্ণ একত্রে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এমাসেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছে। অতঃপর অবস্থানুযায়ী অল্প অল্প করে ২৩ বছরে কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে।

عن ابى هريرةؓ ان رسول الله ﷺ قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين (بخارى ومسلم)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যখন রমাজান মাসের আগমন হয়, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর অভিশপ্ত শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

মাহে রমাজানের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

উপরিউক্ত হাদীসে রমাজানুল মোবারকের দু'টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। যথা–

এক.

জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যার কারণে মানব হৃদয়ে নেক আমল ও ইবাদত বন্দেগির আগ্রহ জন্মায়। জাহান্নামের দরজা করে দেওয়া হয় বন্ধ। যাতে করে অন্তরে আগত গোনাহের কুমন্ত্রণা বিবর্ণ তথা স্বমূলে উৎপাটিত হয়। আল্লামা তূরপুশতী (রহ.) লিখেছেন, জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্য হলো, এ মাসে আল্লাহর রহমতের বারি অতি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা নেক কাজ করার অতি সৌভাগ্য দান করেন, আর আমলও অধিক পরিমাণে কবুল করেন।

জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, গোনাহের আসক্তি, কামনা ও বাসনা দুর্বল হয়ে যায়। এবং অশ্লীলতা, কদর্যতা, নির্লজ্জতা, খারাপ, নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কাজের বাসনা-কামনা কমে যায়। সাধারণ থেকে সাধারণ সংকল্প, ইচ্ছা ও মনোযোগের দ্বারাই গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা সহজসাধ্য হয়ে যায়।

দুই.

উপরিউক্ত হাদীসে মাহে রমাজানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়। শয়তানি শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়।

এসব কিছু শুধু এবং শুধুই এজন্য করা হয়, যাতে আল্লাহর বান্দাগণ অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে ও পূর্ণ মনোযোগসহকারে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারে। প্রবৃত্তি এবং শয়তান তাদের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।

তাই তো দেখা যায়, রমাজানুল মোবারকে সৌভাগ্যশীলগণ তো নেক কাজে অগ্রগামী থাকেনই, এমাসের বরকতে হাজার হাজার বেনামাযী এবং উদাসীন মানুষ নামায, রোযার চিন্তা ফিকির করতে থাকে। এসব আল্লাহর রহমতের প্রতিক্রিয়ারই ফসল।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

কিন্তু প্রশ্ন হয়, যখন শয়তানকে হাত কড়া লাগিয়ে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়, তখন পবিত্র এ মাসে কোনো ব্যক্তি থেকে গোনাহের কাজ প্রকাশ না পাওয়ারই দাবি রাখে। এর পরও মানুষ থেকে বিভিন্ন গোনাহ প্রকাশ পায় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে মুহাদ্দিসগণ বলেন, পুরো এগারটি মাস শয়তান মানুষের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিয়ে এসেছে। রমাজান মাসে শয়তান জিঞ্জিরাবদ্ধ থাকলেও এগার মাসের দীর্ঘ সময়ের শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রভাব মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থেকে যায়। যার কারণে দীর্ঘ সংশ্রবের এই প্রতিক্রিয়া অনেক লোকের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকে। তার পরও এই প্রতিক্রিয়া ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

মাহে রমাজান এবং কালামুল্লাহর মাঝে বিশেষ যোগসূত্র :

আয়াতে কারীমায় প্রথমে এ কথা এসেছে যে, পবিত্র কুরআন এ মাসেই লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ মাসেই রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর নাযিলের সূচনা হয়।

অনুরূপ প্রায় সমস্ত আসমানি কিতাবই এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রমাজান মাসের প্রতি রাতেই হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে এসে তাঁর সাথে পবিত্র কুরআনের দাওর করতেন। অর্থাৎ উভয়ে পালাক্রমে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

উপরিউক্ত কথা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে পাক ও মাহে রমাজানের মাঝে এক ধরনের সাদৃশ্যতা-যোগসূত্র রেখেছেন। এ যোগসূত্রের এক ঝলক হলো তারাবীহর নামায। যা এমাসেই রাখা হয়েছে। এবং তারাবীহে পবিত্র কুরআন খতম করাকে সুন্নাত আখ্যায়িত করা হয়েছে। এজন্য এমাসে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

রমাজান ইবাদতের মৌসুম :

জালেম, অজ্ঞ, সহজ-সরল মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও সাময়িক সাজ-সজ্জা, চাকচিক্যে অতিদ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যায়। এগারোটি মাস বিভিন্ন পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়াতে থাকে। এজন্য মহান আল্লাহ এমন এক বরকতময় মাস দান করেছেন, যাতে মানুষ সাধারণ-সামান্য মনোযোগের ইচ্ছা করলেই নিজের জীবনের গতিকে ঠিক করতে পারে। এ মাসকে নিজের জন্য আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার সোপান বানাতে পারে।

যেমনিভাবে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার জন্য উন্নতির একটি সময় থাকে। গাছে ফল আসার একটি মৌসুম থাকে। অনুরূপভাবে মহান পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগির এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত ও দৃঢ় করার মৌসুম হলো রমাজান মাস।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমাজানের সামগ্রিক হক আদায় করে যথাযোগ্যভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএল-এ পাঠানো হয়।
*	জেলা ভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২০% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যে কোন সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	২০০	৩০০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৭২০	৯০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১০৮০	১২০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১২০০	১৪০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	১৭০০
#	আমেরিকা	১৭০০	২০০০

১বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

সম্মানিত গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্ট্রি ডাকই সকল গ্রাহকের জন্য উত্তম। কারণ সাধারণ ডাকে অনেক সময় ঠিকমত পত্রিকা পৌঁছে না।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ঈদের নামায অতিরিক্ত ৬ তাকবীরে পড়া সুন্নাত

عن القاسم ابى عبد الرحمن قال حدثنى بعض اصحاب رسول الله ﷺ قال صلى بنا النبى ﷺ يوم عيد الفطر فكبر اربعا واربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه۔

"আবু আব্দুর রহমান কাসেম (রহ.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুলফিত্রের দিন আমাদেরকে ঈদের নামায পড়ান, এর প্রতি রাকআতে তিনি চারটি করে তাকবীর বলেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ভুলে যেয়ো না, জানাযার নামাযের তাকবীরের মতো চারটি করে তাকবীর হবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে অবশিষ্ট ৪টি আঙুল দিয়ে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন। (তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৫, হাদীস নং ১৬৫৯)

عن مكحول قال اخبرنى ابو عائشة جليس لابى هريرة ان سعيد بن العاص سال ابا موسى الاشعرى وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله ﷺ يكبر فى الاضحى والفطر فقال ابو موسى كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز۔

فقال حذيفة صدق ۔ فقال ابو موسى كذلك اكبر فى البصرة حيث كنت عليهم وقال ابو عائشة وانا حاضر سعيد بن العاص۔

وفى رواية ابن ابى شيبة زيادة: فما نسيت قوله اربعا كالتكبير على الجنائز۔

"হযরত সাঈদ ইবনুল আস সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) ও হুযাইফা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর এর নামাযে কয় তাকবীর দিতেন? উত্তরে তিনি বলেন, জানাযার নামাযের তাকবীরের সমসংখ্যক (চার) তাকবীর দিতেন। তখন হুযাইফা (রা.) বলেন, ঠিক বলেছেন। আবু মূসা (রা.) আরো বলেন, আমি যখন বসরায় গভর্নর হিসেবে ছিলাম, ঈদের নামাযে এভাবে চার তাকবীর দিতাম। আবু আয়েশা বলেন, এ ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী, সাঈদ ইবনে আসের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

ইবনে আবী শায়বার বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ঈদের নামাযে জানাযার নামাযের মতো চার তাকবীর হবে, বাক্যটি আমি আজও ভুলিনি। (আবু দাউদ ১/৬৮২, হাদীস নং ১১৫৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৪, হাদীস নং ৫৬৯৪, তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৬, হাদীস নং ১৬৬১, মুসনাদে আহমদ ৪/৪১৬, হাদীস নং ১৯

عن علقمة والاسود ان ابن مسعودؓ كان يكبر فى العيدين تسعا اربع قبل القراءة ثم يكبر فيركع، وفى الثانية يقرء فاذا فرغ كبر اربعا ثم ركع۔

"হযরত আলকমা ও আসওয়াদ (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) উভয় ঈদের নামাযে ৯টি করে তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে কেরাআত পড়ার পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের তাকবীর মিলে ৪টি তাকবীর। অতঃপর রুকুর জন্য তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে কেরাআত শেষ করে ঈদের ৩ তাকবীর ও রুকুর একটি তাকবীর মিলে ৪টি তাকবীর দিতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৩, হাদীস নং ৫৬৮৬, তাবরানী-কাবীর ৯/৩৫২, হাদীস নং ৯৫১৭)

عن عبد الله بن الحارث شهدت ابن عباسؓ كبر فى صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات والى بين القراء تين قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك ايضا۔

"ইবনে হারেস বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে বসরায় ঈদের নামায পড়ার সময় ৯টি তাকবীর দিতে দেখেছি। আরো বলেন, আমি সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) কেও এমনই করতে দেখেছি। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৫, হাদীস নং ৫৬৮৯)

৯ তাকবীর কোন কোনটি তা উপরের হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

عن مكحول، قال: اخبرنى من شهد سعيد بن العاص ارسل الى اربعة نفر من اصحاب الشجرة فسألهم عن التكبير فى العيد؟ فقالوا: ثمان تكبيرات، قال فذكرت ذلك لابن سيرين، فقال صدق، ولكنه اغفل تكبيرة فاتحة الصلاة۔

"হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) এক ব্যক্তিকে বায়আতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারী চারজন সাহাবীর নিকট প্রেরণ করেন, ঈদের নামাযে তাদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। জিজ্ঞাসার পর তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে উত্তর আসে "ঈদের নামায (রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীরসহ) ৮ তাকবীর হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিবরণ আমি ইবনে সীরীন (রহ.) কে জানালে তিনি বলেন, "ঠিক বলেছে।" (তবে ঈদের নামাযের ৬ তাকবীর এবং রুকুতে যাওয়ার দুই তাকবীর মিলে ৮ তাকবীরই হয়) কিন্তু এর পূর্বে প্রথম রাক'আতে নামায শুরু করার তাকবীরের কথা এখানে উল্লেখ করেননি। (তাই ৮ তাকবীর বলেছেন অন্যথায় মোট ৯ তাকবীর হতো) (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৮৯৪, হাদীস নং ৫৬৯৫)

عن عبد الله بن الحارث قال: صلى بنا ابن عباسؓ يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات، خمسا فى الاولى، واربعا فى الآخرة ووالى بين القراء تين۔

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস বর্ণনা করেন, হযরত

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাদেরকে একবার ঈদের নামায পড়ান। এতে তিনি মোট ৯ তাকবীর দেন। প্রথম রাক'আতে (তাকবীরে তাহরীমা ও ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ) ৫টি তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাক'আতে (ঈদের নামাযের ৩ তাকবীর ও রুকুতে যাওয়ার তাকবীর মিলে) ৪টি তাকবীর দেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৫, হাদীস নং ৫৭০৭)

عن محمد عن انس بن مالك انه قال تسع تكبيرات خمس فى الاولى واربع فى الاخيرة مع تكبيرة الصلاة۔

"হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা.) বলেন, ঈদের নামাযে মোট তাকবীর সংখ্যা হলো ৯টি। নামায শুরু এবং রুকুতে যাওয়ার তাকবীরসহ প্রথম রাক'আতে ৫টি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ৪টি। (ত্বাহাবী শরীফ ৪/৩৪৮, হাদীস নং ১৬৭৪)

عن ابن جريج ان يوسف بن ما هك اخبرنى ان ابن الزبير كان لا يكبر الا اربعا فى كل ركعة سواء يكبر هن فى كل ركعتين۔

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি ঈদের নামাযের প্রতি রাক'আতেই ধারাবাহিক চারটি তাকবীর প্রদান করতেন।"

সাহাবায়ে কেরামের আমল ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর :

عن كردوس قال ارسل الوليد الى عبد الله بن مسعود وحذيفة وابى مسعود وابي موسى الاشعرىؓ بعد العتمة فقال: ان هذا عيد المسلمين فكيف الصلاة؟ فقالوا : سل ابا عبد الرحمن فسأله فقال: يقوم فيكبر اربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر ويركع فتلك خمس ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ثم يكبر اربعا ويركع فى آخر هن فتلك تسع فى العيدين فما انكر ه واحد منهم۔

"কারদুস (রহ.) বলেন, গভর্নর ওয়ালীদ (রহ.) একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা, হযরত আবু মাসউদ এবং আবু মূসা আশআরী (রা.)-এর নিকট এশার নামাযের পর এ কথা জিজ্ঞেস করার জন্য দূত প্রেরণ করেন যে, মুসলিম জাতির ঈদ আসন্ন। এই ঈদের নামাযের নিয়ম পদ্ধতি কেমন হবে? উপস্থিত সব সাহাবী দূতকে বললেন, তুমি এ বিষয়ে আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস কর। সে লোক ইবনে মাসউদ (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, নামাযে দাঁড়াবে, অতঃপর চারটি তাকবীর প্রদান করবে। (এর প্রথমটি তাকবীরে তাহরীমা বা নামায শুরু করার তাকবীর) এরপর সূরায়ে ফাতেহা ও অপর একটি সূরা পড়বে। তারপর রুকুর তাকবীর দিয়ে রুকু করবে। এই হলো প্রথম রাক'আতের পাঁচ তাকবীর। অতঃপর দাঁড়াবে, এরপর সূরায়ে ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। অতঃপর চার তাকবীর দেবে, এই চার তাকবীরের শেষ তাকবীরের সময় রুকু করবে। এই হলো দুই রাকআতে সর্বমোট ৯ তাকবীর যা উভয় ঈদের নামাযে হবে। উপস্থিত সাহাবীগণের কেউই তাঁর সাথে দ্বিমত ব্যক্ত করেননি। (তাবারানী মু'জামুল কাবীর ৯/৩৫১, হাদীস নং ৯৫১৪, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৪, হাদীস নং ৫৭০৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে ঈদের নামাযের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে ঠিক একই নিয়ম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত আনাস (রা.) এবং হযরত মুগীরা বিন শু'বা থেকেও বর্ণিত হয়েছে। (এর জন্য মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৪-২৯৯৫, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৪৯৩-৪৯৬ এবং তাহাবী শরীফ ৪/৩৪৫-৩৪৮ দেখা যেতে পারে)

ঈদের নামাযে ৬ তাকবীরের ওপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা :

عن ابراهيم النخعى قال: قبض رسول الله ﷺ والناس مختلفون فى التكبير على الجنائز لاتشاء ان تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله ﷺ يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله ﷺ يكبر خمسا ۔

وآخر يقول سمعت رسول الله ﷺ يكبر اربعا الا سمعته فاختلفوا فى ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض ابو بكر رضى الله عنه فلما ولى عمر رضى الله عنه ورأى اختلاف الناس فى ذلك شق ذلك عليه جدا فارسل الى رجال من اصحاب رسول الله ﷺ فقال انكم معاشر اصحاب رسول الله ﷺ متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على امر يجتمع الناس عليه فانظروا امرا تجتمعون عليه فكأنما ايقظهم فقالوا نعم مارأيت ياامير المؤمنين فاشر علينا فقال عمر رضى الله عنه بل اشيروا انتم على فانما انا بشر مثلكم فتراجعوا الامر بينهم فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير فى الاضحى والفطر اربع تكبيرات فاجمع امرهم على ذلك۔

"হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তিকালের পর জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা নিয়ে সাহাবাগণের (রা.) মধ্যে মতভেদ ছিল। কেউ বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ৭ তাকবীর দিতে শুনেছি, কেউ বলতেন, ৫ তাকবীর দিতে শুনেছি, আর কেউ বলতেন ৪ তাকবীর দিতে শুনেছি। হযরত আবু বকর (রা.) এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে এ মতানৈক্য চলতে থাকে।

হযরত উমর (রা.) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পরিস্থিতি দেখে তিনি ব্যথিত হন। তাই একজন বাহকের মাধ্যমে সবাইকে একত্রিত করে বললেন, আপনারা আর

কতকাল মতানৈক্য করবেন? আপনারা যেসব বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবেন, পরবর্তীরাও এতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে। অতএব সবাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো উপায় খোঁজেন।

বলাবাহুল্য, উমর (রা.) এ বক্তব্যের মাধ্যমে সাহাবাগণকে জাগ্রত করে তুলেন। তাই তাঁরা বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা ভাল মনে করেন, নির্দেশ করুন। হযরত উমর (রা.) বললেন, বরং আপনারা নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করুন। আমিও তো আপনাদের মতোই একজন মানুষ।

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর মতবিনিময় পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে একমত হলেন। আর তা হলো জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর দিতে হবে, যেভাবে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের প্রত্যেক রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ ৪টি তাকবীর দেওয়া হয়। তখন এ সিদ্ধান্তের ওপর তাদের মধ্যে ইজমা তথা ঐকমত্য সংঘটিত হয়। (তাহাবী শরীফ-১/৪৯৬, হাদীস নং ২৬১১)

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় ঈদের নামাযে প্রত্যেক রাক'আতে রুকুর তাকবীরসহ চারটি তাকবীর হওয়া সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ও চূড়ান্ত মীমাংসিত সিদ্ধান্ত।

বোঝা গেল, ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর হওয়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল, সাহাবায়ে কেরামের আমল, তাবেঈন ও তবে তাবেঈনের আমল এবং তখন থেকে চলে আসা পুরো উম্মতের আমল।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর আহ্বানে এর ওপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমাও সংঘটিত হয়। এ সকল অকাট্য দলিলের ভিত্তিতেই আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে ঐক্যবদ্ধ মতের ভিত্তিতে এই আমল চলে আসছে।

তথাপি আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক তা নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিতে চায়। এ ব্যাপারে যারা মতানৈক্য করতে চায় মনে হয় তারা সাহাবায়ে কেরামের বুঝ ও মতামতের ওপর নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিতে দ্বিধা করেন না। বা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ও কাজের মর্মার্থ বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামকে অযোগ্য মনে করেন। (নাউজু বিল্লাহ)

সূত্র : ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী, মুফতী ও মুহাদ্দিস মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

বি:দ্রঃ

আমরা মাসিক আল-আবরার জুলাই সংখ্যাতে ২০ রাক'আত তারাবীহ'র বিষয়ে পবিত্র হাদীসের বেশ কয়টি দলিল পেশ করেছিলাম। এই সংখ্যাতে ঈদের নামাযে ৬ তাকবীরের অকাট্য দলিল পেশ করা হলো। বিষয়দ্বয় সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশের মুফতী ও মুহাদ্দিস, মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী সাহেবের সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি অনবদ্য সংকলন ***"২০ রাকআত তারাবীহ"*** *ও* ***"ঈদের নামাযে ৬ তাকবীর কেন"*** *সংগ্রহে রাখা যায়।*

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

(১) শেয়ারের যাকাত

মুফতী শাহেদ রহমানী

গতসংখ্যার দরসে ফিক্বহে যাকাতের সাধারণ নিয়মাবলী বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবার থাকছে শেয়ারের যাকাত সংক্রান্ত একটি মাসআলা। সাথে থাকছে চাঁদ দেখা বিষয়ক জটিলতার একটি ব্যাখ্যা।

শেয়ার ব্যবসা বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি ব্যবসা। যার সাথে শরীয়তেরও অনেক বিধি-বিধানের সম্পর্ক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিধান হলো শেয়ারের যাকাত প্রদান করা। তবে কথা হলো এই যাকাত কে প্রদান করবে? কোম্পানি না শেয়ার হোল্ডার?

☆ **শেয়ার হোল্ডার যাকাত প্রদান করবে :**

কোম্পানি যেহেতু কোনো ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়, তাই কোম্পানি শেয়ারের যাকাত প্রদান করবে না। বরং শেয়ার হোল্ডারগণই প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে শেয়ারের যাকাত প্রদান করবে। তবে যদি কোম্পানির প্রস্পেক্টাস বা এজিএম অথবা রাষ্ট্রীয় আইনে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, কোম্পানি নেসাবের মালিক শেয়ার হোল্ডারদের পুঁজি থেকে প্রতিবছর যাকাত প্রদান করবে তাহলে কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে পারবে।

নেসাব নির্ধারণে শেয়ারের প্রকার :

মৌলিকভাবে শেয়ারের মূল্য তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১। Face value - অর্থাৎ সার্টিফিকেটে লিখিত মূল্য।

২। Market value- অর্থাৎ যে মূল্যে শেয়ার বাজারে বিক্রি হয়।

৩। ব্রেক আপ ভ্যালু (Break up value) অর্থাৎ যদি কোম্পানি যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে অস্তিত্বহীন হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক শেয়ারের বিনিময়ে কোম্পানির আসবাবপত্রের যে অংশ আসবে তাকেই ব্রেক আপ ভ্যালু বলা হয়।

নেসাব নির্ধারণে কোন মূল্যটি গ্রহণযোগ্য হবে?

এখন প্রশ্ন হলো, শেয়ার হোল্ডারগণ কোন মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত আদায় করবেন?

এখানে প্রথমেই জেনে নিতে হবে যে, শেয়ার কোম্পানির যাবতীয় আসবাবপত্রে গড় অনুপাতে শেয়ার হোল্ডারের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। আর কোম্পানির সব ধরনের আসবাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা:

ক. যাকাতের উপযোগী যেমন, নগদ অর্থ এবং ব্যবসায়ী পণ্য ইত্যাদি।

খ. যাকাতের অনুপযুক্ত। যেমন, ইমারত, মেশিনারিজ ইত্যাদি।

শেয়ার ক্রয়ের উদ্দেশ্য :

শেয়ার মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্রয় করা হয়।

১. ক্যাপিটাল গেইন (Capital gain) অর্থাৎ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করার জন্য। এই সূরতে যেহেতু শেয়ার স্বয়ং ব্যবসায়ী পণ্যের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য শেয়ার হোল্ডারদের ওপর তার বাজারদরের হিসাব মতে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

২। Dividend অর্থাৎ কোম্পানির অংশীদার হয়ে কোম্পানি থেকে মুনাফা অর্জন করার জন্য। এমতাবস্থায় নিম্নে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে।

শেয়ার কোম্পানিগুলোর প্রকার :

শেয়ার কোম্পানিগুলো মূলত তিন প্রকার হয়ে থাকে।

১. সার্ভিস ও কারিগরি কোম্পানি। যাদের উদ্দেশ্য আসবাবপত্র বিক্রি করা নয় বরং সেবা প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি, ডায়িং কোম্পানি, আবাসিক হোটেল কো: মোবাইল কো: এবং বিমান কোম্পানি ইত্যাদি। এ ধরনের কোম্পানির শেয়ারের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে শেয়ার মূলে যা মুনাফা হবে তা শেয়ার হোল্ডারগণ তাদের অন্যান্য যাকাতের উপযুক্ত মালের সাথে শামিল করার পর তা নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় নয়।

২. ব্যবসায়ী কোম্পানি যেগুলো পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। যেমন আমদানি ও রপ্তানিকারক ব্যবসায়ী কোম্পানি, নিজস্বভাবে তৈরিকৃত বস্তু ক্রয়-বিক্রয়কারী কোম্পানি এবং কাঁচামাল দ্বারা কোনো বস্তু তৈরি করে বাজারজাতকারী কোম্পানি ইত্যাদি।

যেহেতু এসব কোম্পানি ব্যবসায়ী কাজে নিয়োজিত তাই এদের শেয়ারে যাকাত ওয়াজিব হবে। শেয়ারের বাজারদর থেকে নির্মাণ সামগ্রী মেশিনারি এবং স্থায়ী সম্পদকে বাদ দিয়ে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

৩. এমন কোম্পানি যেগুলো ব্যবসায়ী ও কারিগরি উভয় ধরনের কার্যক্রমে জড়িত। যেমন চিনি কোম্পানি, প্রেস কোম্পানি এবং গাড়ি ও বিমান তৈরি করে বিক্রিয়কারী কোম্পানি।

এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ারের হুকুম হল শেয়ারের বাজারদর থেকে নির্মাণ

সামগ্রী মেশিনারিজ এবং স্থায়ী সম্পদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের যাকাত আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ২নং এবং ৩নং কোম্পানিগুলোর শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষে সাধারণত এই বিষয়টি নির্ণয় করা কঠিন যে, তাদের শেয়ার মূলে কী পরিমাণ সম্পদ যাকাতের উপযোগী আর কী পরিমাণ অনুপযোগী। এই কারণে পূর্ণ সতর্কতা এর মধ্যে যে, এই জাতীয় কোম্পানিগুলোর শেয়ারের পুরো বাজার দরে যাকাত আদায় করে দেওয়া।

তথ্যসূত্র : (ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশত ওয়া তেজারত ৯২-৯৩, তেজারতী কোম্পানিউঁ কা লায়েহায়ে আমল ৭১-৭৫, শিরকত ওয়া মুদারাবাত আসরে হাজের মেঁ' ৩৪৭-৩৫৩)

(২) চাঁদ দেখা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

যেসব দেশে সরকারিভাবে চাঁদ দেখার কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নিয়মনীতি নেই সে সব দেশে রূয়তে হেলাল তথা চাঁদ দেখার বিষয়টি রমাজান এবং ঈদের সময় মুসলমানদের মাঝে বিভেদ এবং বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনকি একই স্থানে রোযা আর ঈদ দুটুই পালন করছে একই সময়ে। কেউ ঈদ করছে কেউ রাখছে রোযা। কোথাও কোথাও এ নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদও হচ্ছে অহরহ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বিস্তর গবেষণা ও লেখালেখিও চলছে। তবে সম্মিলিতভাবে বিষয়টি সর্বোচ্চ কোনো ফোরামে আলোচনা হয়নি। চলতি বছরই প্রথম বারের মত মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ ফোরাম মক্কাস্থ ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী বিষয়টি নিয়ে তিন দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক ফিক্বহ সম্মেলনের আয়োজন করে। ১১,১২,১৩ ফেব্রুয়ারী মক্কাশরীফে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে বিশ্বের তাবৎ মুসলিম উম্মাহর শীর্ষ ফক্বীহগণ অংশ গ্রহণ করে যে সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়েছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

সেমিনারে চাঁদ দেখা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা হলেও মৌলিকভাবে দু'টি মাসআলা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

১. চাঁদের প্রমাণে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?

২. اختلاف مطالع তথা উদয়স্থলের ভিন্নতার হুকুম কী? অর্থাৎ এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে তা অন্য জায়গার জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

এদুটি বিষয়ই ছিল উক্ত সেমিনারে আলোচনার মূল বিষয়। উল্লিখিত বিষয় দুইটির মধ্য থেকে প্রথম বিষয়ে সেমিনারে মূলত তিনটি মতামত পেশ করা হয়।

১. শরয়ী রূয়তে হেলালের জন্য হিসাব/জ্যোতির্বিদ্যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বরং চোখে দেখা সাক্ষীর ওপরই তা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। হিসাবের ওপর ভিত্তি করে চাঁদ থাকা না থাকার সিদ্ধান্ত করা যাবে না। হিসাব অনুযায়ী চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব না হলেও চাঁদ দেখার সাক্ষী পাওয়া গেলে তদানুযায়ী চাঁদের ফায়সালা করা হবে। এই মতটি সৌদি আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন সালেহ সেমিনারের শুরুতেই তুলে ধরেন।

২. জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব যেহেতু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চাঁদের অবস্থানস্থল নির্ণয় করে এবং এর মধ্যে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকে না এই কারণে শুধুমাত্র হিসাবের ভিত্তিতে চাঁদের সিদ্ধান্ত করা উচিত। যদি হিসাব অনুযায়ী চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব হয় তবে দেখা না যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে দেওয়া জরুরি। যদিও কোনো লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই প্রস্তাবটি ছিল সেমিনারে অংশগ্রহণকারী মাত্র কয়েকজনের।

৩. যদিও চাঁদ দেখার প্রমাণ শুধুমাত্র হিসাব দ্বারা হতে পারে না কিন্তু যদি কখনো চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া হিসাব মতে অসম্ভব হয়, যেমন চাঁদ সূর্যের পূর্বেই অস্তমিত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষী প্রদান করে তাহলে ওই সাক্ষী অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সেমিনারে উপস্থিত অধিকাংশ আলেমের মত কিংবা অবস্থান এটিই ছিল। যেহেতু এই মতটি সৌদি আরবের বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তাই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা হয়।

উল্লেখ্য, এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য এই নয় যে, দেখার পরিবর্তে হিসাবকে চাঁদের প্রমাণের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে বরং সাক্ষীর যাচাই-বাচাই করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। দীর্ঘ আলোচনার পর উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাবনার ওপর একমত হয়ে যান।

দ্বিতীয় মাসআলা :

اختلاف مطالع। অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা সম্পর্কেও তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত সেমিনারে উপস্থাপিত হয়।

১. একটি মত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব মোতাবেক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ওই ফতওয়ার ওপর ভিত্তি করে যার মধ্যে তিনি শামের চাঁদ দেখাকে মদীনা শরীফে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মেনে নেননি। অতএব এই মতানুযায়ী প্রত্যেক শহরে ওই শহরের রূয়ত তথা চাঁদ দেখাই গ্রহণযোগ্য হবে। অন্য শহরের দেখা সেখানে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই মতটি ইমামে হেরম সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ

পেশ করেন। তবে সাথে সাথে তিনি এ কথাও বলেন যে, মাসআলাটি যেহেতু গবেষণামূলক, তাই ইসলামী হুকুমতের অধীনে যদি কোনো হাকীম এক রাষ্ট্রের সব শহরে রূয়ত তথা চাঁদ দেখার হুকুম জারি করে দেন, তাহলে তার হুকুম গ্রহণযোগ্য হবে।

২. দ্বিতীয় অবস্থানটি ছিল এই যে, اختلاف مطالع। অর্থাৎ উদয়স্থলের ভিন্নতা মোটেই ধর্তব্য হবে না। বরং বিশ্বের কোথাও চাঁদ দৃষ্টিগোচর হলে তা পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। মালেকী এবং হাম্বলীদের মনোনীত মাযহাব এটিই এবং হানাফীদের আসল মাযহাবও এমনই।

এই অবস্থান গ্রহণকারীগণ এও বলেন যে, মক্কা শরীফকে পুরো মুসিলম বিশ্বের কেন্দ্র করে সেখানকার রূয়ত/দেখাকে পুরো পৃথিবীর জন্য গ্রহণযোগ্য মানা হবে। কিন্তু এর ওপর বিশ্ববিখ্যাত ফক্বীহ আল্লামা মুহাম্মদ তকী উছমানী (দা.বা.) কার্যকর এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যেসব দেশ মক্কা শরীফের পূর্বে অবস্থিত সেসব দেশে রমাজান বা ঈদের সিদ্ধান্তে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কা শরীফে চাঁদ দেখা বা না দেখার ঘোষণা না হবে। এর ফল দাঁড়াবে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের লোকজন কয়েক রাত পর্যন্ত রমাজান বা ঈদের সিদ্ধান্ত করতে পারবে না। এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দ্বিতীয় মতগ্রহণকারীগণ দিতে পারেননি।

৩. তৃতীয় অবস্থান এই ছিল যে, যদি পূর্বে অবস্থিত কোনো দেশে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর প্রমাণ পশ্চিমে অবস্থিত কোনো দেশে হয়ে যায় তাহলে পশ্চিমা বিশ্ব ও তার ওপর আমল করবে।

সর্বশেষ এই অবস্থানটিকে সেমিনারের অধিকাংশ উপস্থিতি উত্তম বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মোট কথা হলো এসব মাসআলার ওপর তিন দিনব্যাপী আলোচনার পর সেমিনারের পক্ষ থেকে যেসব প্রস্তাব পেশ করা হয়, তা যথাক্রমে নিম্নে পেশ করা হলো।

১. চাঁদের মাসের সূচনা এবং সমাপ্তির প্রমাণের জন্য আসল মাপকাঠি সরাসরি চাঁদ দেখা, চাই তা স্বচক্ষে দেখা হোক বা নভোথিয়েটার অথবা মহাকাশ পর্যবেক্ষণকারী অন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্যে দেখা হোক। যদি চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং তা দেখে ঈদ পালন করো। তবে যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে শা'বান মাসের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

এ-জাতীয় আরো অনেক হাদীস আছে, যা এ কথার দলিল যে, চাঁদের মাসের সূচনা এবং সমাপ্তির আসল মাপকাঠি চাঁদ দেখা।

২. বছরের প্রত্যেক মাসে চাঁদের অনুসন্ধান করা ওয়াজিব আলাল কিফায়া। কারণ এর ওপর বহু ওয়াজিব আমল নির্ভরশীল।

৩. সাক্ষীদাতার মধ্যে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকা এবং সাক্ষীদাতার মধ্যে প্রতিবন্ধক কোনো কিছু না থাকা আবশ্যক। তার দৃষ্টি শক্তির তীক্ষ্ণতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং চাঁদ দেখার সময় দেখার ধরন কিরূপ ছিল সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়াসহ অন্যান্য জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক। যাতে তার সাক্ষ্যের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয় না থাকে।

৪. জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের সূত্র একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র। যার নিজস্ব কিছু মূলনীতি রয়েছে। এই শাস্ত্রের কিছু ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। যেমন : চাঁদ এবং সূর্য নিকটবর্তী হওয়ার সময়, চাঁদ সূর্যের পূর্বে বা পরে অস্তমিত হওয়া এবং চাঁদের উচ্চতা সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার পরবর্তী রাতে কতটুকু হবে ইত্যাদি।

৫. এক রাষ্ট্রের মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য ওই ভূখণ্ডের কোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হবে, যেন তাদের রোযা এবং ঈদ এক সাথে হয়।

৬. যেসব দেশে বসবাসকারী মুসলমনাগণ সংখ্যালঘু যদি কোনো কারণে চাঁদ দেখা তাদের জন্য সম্ভব না হয় তাহলে তারা নিকটবর্তী কোনো মুসলিম দেশের দেখার ওপর আমল করবে। অথবা নিকটবর্তী এমন দেশের দেখার ওপর আমল করবে যেখানে মুসলমানদের প্রনিধিত্বকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চাঁদ দেখার খবর প্রকাশ করা হয়।

৭. চাঁদের মাসের সূচনার ফায়সালা করা যেহেতু এর সাথে ইবাদতের সম্পর্ক তাই এটি শরয়ী ব্যাপার। অতএব এর দায়িত্ব আলেম সমাজের ওপর বর্তাবে, যাদেরকে পূর্ণ অধিকার সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং মহাকাশবিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব হলো চাঁদের জন্ম তার অবস্থান এবং ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও চাঁদ দেখার ব্যাপারে সূক্ষ্ম হিসাব এবং অন্যান্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সরবরাহ করা, যা ওই বিশেষ শরয়ী অধিদপ্তরের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়।

৮. মানুষের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড এবং ব্যবস্থাপনা সহজতর করার খাতিরে শরীয়ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন উন্নত জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব এবং মহাকাশ বিষয়ক যন্ত্রপাতি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কেননা ইসলাম বিজ্ঞান এবং তার বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৯. যখন কোনো মাসের সূচনা কোনো শরয়ী অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে যায় এবং তার ওপর মুসলিম রাষ্ট্রের মহাপরিচালক ভরসা করে নেয়, তাহলে এ ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং সন্দেহের সৃষ্টি করা জায়েয নেই। কেননা তা ইজতিহাদী মাসআলা যার মধ্যে হাকীমের ফয়সালা দ্বারা বিতর্কের অবসান ঘটে।

১০. মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে যে, তারা যেন চাঁদ দেখার মাধ্যম সংগ্রহ এবং চাঁদ দেখার জন্য কিছু দপ্তরকে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

১১. কনফারেন্স রাবেতা আল-আলমিল ইসলামীকে এই প্রস্তাব পেশ করছে যে, এর পক্ষ থেকে এমন একটি ইসলামী এদারা/প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হোক, যা শরীয়ত বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদদের সমন্বয়ে হবে, যেন তারা উভয় ক্ষেত্রে রিসার্চমূলক যত কাজ হয়েছে এবং রচনা-প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছে এবং এই বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত অন্যান্য কনফারেন্স ও সেমিনারগুলোতে পেশকৃত প্রবন্ধসমূহ সাথে সাথে ফিকহী সভা বা আকাবির ওলামায়ে কেরামের বৈঠক অথবা ইসলামী রিসার্চমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ হতে যেসব তথ্য-দলিল উপস্থাপিত হয়েছে সেসবের ওপর গভীর চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে। এবং এই ব্যাপারে চেষ্টা করে যে, চাঁদের মাসসমূহের সূচনাতে একাত্বতা তৈরি করার ক্ষেত্রে ঐক্যমত সৃষ্টি হয়ে যায়। এবং মক্কা মুকাররামাকে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে এবং হিজরী তারিখের মধ্যে একাত্বতা সৃষ্টিকারী ক্যালেন্ডার প্রকাশের জন্য নির্ভরযোগ্য হিসেবে মেনে নেয়। এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম বিশ্বের বিশেষ শরয়ী এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের মধ্যে একাত্বতা সৃষ্টি করবে এবং ওই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র রাবেতা আল-আলমিল ইসলামীর মধ্যে হবে এবং মক্কা শরীফে হবে, যা ইসলামের পূণ্য ও কল্যাণের হৃৎপিণ্ড।

এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম বিশ্বের ফিকহী মজমা এবং ফতওয়ার প্রতিষ্ঠানসমূহে অথবা তাদের পক্ষ থেকে বাচাইকৃত শরীয়ত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম এবং অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদদের সমন্বয়ে হবে। যে নিজের গবেষণার ফলাফল এবং এ সেমিনার থেকে প্রকাশিত বিষয়গুলোকে রাবেতার আল-মাজমাউল ফিকহীর সামনে উপস্থাপন করবে।

লেখা আহ্বান লেখা আহ্বান লেখা আহ্বান

আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহ্বান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লেখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলামপ্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মেটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল হতে হবে।
৪। কোনো সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ-৪ সাইজের কাগজে এক পিঠে কম্পোজ করে অথবা সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাঁট করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি ইংরেজী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌঁছাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতর : মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

হযরত ওয়ালা বলেন, কুরআনে পাকের প্রতি অক্ষরে দশ নেকীর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন قـــل শব্দে দুই অক্ষরের জন্য ২০ নেকীর প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি قل এর স্থানে كُل পড়ে এবং قـاف আদায় না করে তখন ঐ নেকী কিভাবে অর্জিত হবে। যদি উর্দু ভাষার পরীক্ষা নেয়ার সময় বলা হয় ظـالم শব্দটি লেখো, আর ছাত্র লেখল جـالم। তখন কি আপনি তাকে পাশের নম্বর দেবেন? অথচ চারটি অক্ষরের মধ্যে শুধু একটি ভুল করল আর তিনটিই শুদ্ধ লিখল। অনুরূপভাবে আপনি বলেছেন طـــوطـــا লিখুন, আর সে লিখল تـــوتـــا তখন কি তাকে কোনো নম্বর দেবেন? সুতরাং যেই সিদ্ধান্ত উক্ত ভুলসমূহের ক্ষেত্রে আপনি নিজে করবেন, কোরআনে পাকের তেলাওয়াতের ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত আপনার করতে হবে। তাই অতি গুরুত্ব সহকারে কুরআনে পাকের তেলাওয়াত, অক্ষরসমূহ বিশুদ্ধ ভাবে মশ্ক করার মাধ্যমে করা জরুরি। এছাড়া কুরআনে পাকের ভুল শিক্ষার অভিশাপ থেকে মাদ্রাসার পরিচালকদেরও বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। এবং সদকায়ে জারীয়ার স্থলে তার বিপরীত গোনাহে জারীয়া হবে।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর দরবারে বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার বড়ই গুরুত্ব ছিল। অনেক শায়খুত তাফসীর এবং শায়খুল হাদীসদেরকেও থানা ভবনের খানকায় নূরানী কায়দা পড়ার আদেশ দেওয়া হতো। এবং তজবীদ বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব জামালুল কুরআন পড়ানো হতো। কোনো কবির কথা বিকৃতভাবে পড়ে দেখুন কী পরিমাণ তিনি অসন্তুষ্ট হন। অথচ এ কালামে পাক তো বিশ্ব পালনকর্তা ও আহকামুল হাকেমীন-এর কালাম। কিন্তু এ কালামে পাকের অক্ষরসমূহ কী পরিমাণ শুদ্ধ ও তাজবীদের নিয়ম-নীতিসমূহের কী পরিমাণ গুরুত্ব হওয়া উচিত সে দিকে লক্ষ করা প্রয়োজন। কুরআনে পাকের সম্মান মর্যাদার সাথে সাথে হিফজ এবং নাজেরার ছাত্রদের সম্মান, মর্যাদাও অন্তরে রাখা উচিত। বিভিন্ন মাদরাসা পরিদর্শনের জন্য যখন যাওয়া হয় তখন দেখা যায় কাফিয়া জামাতের শ্রেণীকক্ষের কার্পেট উন্নতমানের এবং হেফজখানার কার্পেটসমূহ পুরাতন ও নিম্নমানের। এতে অত্যন্ত ব্যথিত হই। এই সব মাদরাসার মুহতামিম সাহেবানের উদ্দেশ্যে বললাম। এ ধরনের অবস্থা কেন? প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলির এত গুরুত্ব আর স্বয়ং কুরআন পাক যা আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার সঙ্গে এ ধরনের দূরাচারণ।

আলহামদু লিল্লাহ, আমাদের মাদরাসায় উন্নতমানের কার্পেট আসলে তা প্রথমে হিফজ বিভাগে বিছানো হয় এবং সেখানে পুরাতন হয়ে গেলে তারপর কিতাব বিভাগের শ্রেণীকক্ষে বিছানো হয়। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা স্মরণে এল। এক মন্ত্রীর ছেলের সূরায়ে বাক্বারা শেষ করার পর মন্ত্রীসাহেব আড়াই শত স্বর্ণমুদ্রা উস্তাযের খিদমতে হাদিয়াস্বরূপ পেশ করেন। উস্তায বললেন, এতবড় হাদিয়া কেন? আমি তো আড়াই শত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার মতো বড় কোনো কাজ করিনি। মন্ত্রী সাহেব বললেন, আমার সাথে একাকী সাক্ষাৎ করবেন। উস্তায একাকী সাক্ষাৎ করতে গেলে মন্ত্রীসাহেব বলেন, আমার ছেলেকে আর পড়াতে আসবেন না। কারণ আপনার অন্তরে সূরায়ে বাক্বারার মূল্য যখন আড়াইশত স্বর্ণমুদ্রা থেকেও কম, তাহলে আমার ছেলের অন্তরে কুরআনের সম্মান ও মর্যাদা কিভাবে সৃষ্টি হবে? এ থেকে বোঝা যায়, ঐ যুগে আমীরদের অন্তরের কী অবস্থা ছিল। আলহামদু লিল্লাহ আমাদের দাওয়াতুল হক, (হারদূয়ী)-এর তত্ত্বাবধানে ৬৮ খানা মাদরাসা ১৬০ জন শিক্ষক ও আনুমানিক চার হাজার ছাত্র কুরআনে পাকের শিক্ষা নিচ্ছেন। আমাদের মাদরাসাসমূহে বিভিন্ন হাফেজ সাহেবানের বেতন বড় বড় উলামায়ে কেরাম থেকেও বেশি নির্ধারণ করা হয়। আমাদের মাদরাসার বেতনের হার প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয় (যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়)। বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাকের খেদমতের দিকে গুরুত্ব দেওয়ার বরকতে কোনো সময় আর্থিক সংকট হয়নি। অথচ লাখ লাখ টাকা বার্ষিক খরচ হয়। আমাদের মাদরাসা মসজিদে জেহরী বা সিররী নামায, ফরজ বা তারাবীহ সর্বপ্রকার নামাযের ইমামতিতে তাজবীদ ও বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের দিকে লক্ষ রাখা হয়। কিছুসংখ্যক ইমামকে দেখা যায় জেহরী নামাযসমূহের তেলাওয়াতে তাজবীদের গুরুত্ব দেন। আর সিররী তথা নিঃশব্দ নামাযে নিয়মকানুন আর মানেন না। অথচ উক্ত নিয়মকানুন শুধু জেহরীর সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা সর্বাবস্থায় জরুরি বিষয়। এই ব্যাপারে একটি উদাহরণ হলো, কোনো সময় সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত গাড়ি চালানোর জন্য যদি পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং কিছু লোক লালবাতির সিগন্যাল অমান্য করে এলোপাতাড়ি গাড়ি চালিয়ে মানুষ মেরে বা ক্ষতি করে আগে পৌঁছে যায় আর কেউ প্রতিটি সিগন্যাল মেনে কারো কোনো ক্ষতি না করে গন্তব্যে পৌঁছে, তাহলে পুরস্কার কাকে দেওয়া হবে চিন্তা করুন। প্রথম নম্বরের লোকদের তো পুরস্কার দূরের কথা তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপ তারাবীহর নামাযে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে যারা তাজবীদের নিয়মকানুনের পরোয়া করে না বরং মুক্তাদিদের খুশি করার জন্য আল্লাহ তাআলাকে নারাজ করে তাদেরও পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তির আশঙ্কা প্রবল।

অনুবাদ : **মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল**
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

মালফূযাতে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম এর বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনের উদ্দেশে এবং বিভিন্ন মাহফিলে দেওয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মাওয়ায়েয ও বয়ান থেকে সংগৃহীত)

☆হযরত মুফতী সাহেব হুজুর এই রমাজানের শুরুতেই বসুন্ধরা মসজিদে দূর-দূরান্ত থেকে আসা সালেকীনের জামাত ও ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, রমজান মাস বড়ই বরকতময় মাস। রাত ও বরকতময়, দিনও বরকতময়। রমাজান মাসে খেলেও ছওয়াব। খাওয়ালেও ছওয়াব। অন্য মাসে নিজে খেলে কোনো ছওয়াব নেই, দাওয়াতের খানা খেলে অথবা খাওয়ালে ছওয়াব। কিন্তু রমাজান মাসে খেলেও ছওয়াব, না খেলেও ছওয়াব। সারা দিন মুসলমানগণ না খেয়ে থাকেন। সারা দিনই ছওয়াব পান। ইফতার করেন ছওয়াব, সেহেরী খান ছওয়াব, কাউকে ইফতার করান ছওয়াব, সেহরী খাওয়ান ছওয়াব।

☆ বলেন, আমি দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়া শেষ করে ১৭ই শা'বান দেশে ফিরে আসি। তখন দিলে আসল রমাজানের পর তো দ্বীনি মাদরাসায় খেদমত করতে হবে। আর খেদমতে থাকাকালীন রমাজান মাসে তাহসীল তথা চাঁদার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ই'তিকাফের সুযোগ নাও হতে পারে। তাই মাহে রমাজানে ১মাস ই'তিকাফ করার নিয়ত করলাম। পরে ৪০ দিনের নিয়্যাত করে নেই। এ কথা আমার ছোটবেলার এক সাথী জানতে পেরে তিনিও চল্লিশ দিন ই'তিকাফের আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর আমরা দু'জন নাজিরহাট বড় মাদরাসার মসজিদে ই'তিকাফ করি।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, তনখাহ বা বেতন না নিয়ে পড়ানোর তাওফীক হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করতে থাকুন। বেতনও নিতে থাকুন। যখন সুযোগ হবে তখন বেতন নেওয়া বাদ দেবেন। অতএব মউত পর্যন্তও যদি বেতন না নেওয়ার সুযোগ না হয় আর আপনি দু'আ করতে থাকেন ইনশাআল্লাহ বেতন না নিয়ে পড়ানোর ছওয়াব পেয়ে যাবেন।

☆ যখন বেতন হাতে আসবে তখন বরকতের দু'আ করবেন। اللهم بارك فيه ইয়া আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত দান করুন।

☆ মুরব্বীরা বলেন, দুইটি গুণ থাকলে কামিয়াবী আসবে। একটি এখলাস অপরটি হলো আখলাক। এখলাসের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে আর আখলাকের সম্পর্ক বান্দার সাথে। এখানে সালেকীনের জমা'আতে অনেক ওলামায়ে কেরাম এসেছেন তাঁদের প্রতি এখলাস এর নেকগুমানী-সু-ধারণা করুন। তখন আপনি ছওয়াব পাবেন। মনে করুন সবাই আল্লাহকে পাওয়ার মেহনতের জন্য এসেছেন। আখলাকের সম্পর্ক যেহেতু বান্দার সাথে, এখন আপনি দেখুন তালেবে ইলমরা আপনাকে আখলাক ওয়ালা বা উন্নত চরিত্রের অধিকারী বলে কি না? উস্তাদগণ আপনাকে সচচরিত্রের অধিকারী বলেন কি না? পাড়া-প্রতিবেশীরা আপনাকে আখলাক ওয়ালা বলে কি না? এখানে আখলাক বলতে "আখলাকে নববী' তথা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রদর্শিত সদাচারণ ও উন্নত চরিত্রকে বোঝানো হয়েছে। যার কথা কুরআনে কারীমে এসেছে انك لعلى خلق عظيم . আয়াতে, যে আখলাকের ব্যাপারে নবীজি বলেছেন– تخلقوا باخلاق الله (আল্লাহর নির্দেশিত চরিত্রে ও সদাচারণে সুসজ্জিত হও।

☆ বলেন, আমাদের এখানে একটা মেহনত চলছে, মেহনত চাঁদা না উঠানোর নয় বরং চাঁদা উঠানোর পদ্ধতি পরিবর্তনের। বড়রা বলেছেন, اس قسم کے مدارس چندہ پر چلا کرتے ہیں "এ সকল মাদরাসা চাঁদার ওপরই চলে থাকে।" দারুল উলূম দেওবন্দের اصول ہشتگانہ আট মূলনীতিতে আছে দ্বীনি মাদরাসার স্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত থাকবে না। তাহলে চলবে কিভাবে? চাঁদার মাধ্যমেই চলবে। তবে পদ্ধতি বদলাতে হবে। চাঁদা উঠানোর পদ্ধতি দুটি। মালওয়ালা বা দাতা আপনার কাছে আসবে অথবা আপনি মালওয়ালার কাছে যাবেন। এখন আপনি কোনটি অবলম্বন করবেন? হযরত মাওলানা আবরারুল হক্ব সাহেব হারদূয়ী (রহ.)-এর কাছে "মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা"র উপদেষ্টা হওয়ার দরখাস্ত পেশ করা হলে দুটি ওয়াদা নেন। ১. آپ لوگ تحصیل نہ کریں "আপনারা প্রচলিত পদ্ধতির চাঁদা উঠাবেন না।" ২. آپ کسی اہل مال کے پاس مال کیلئے نہ جایا کریں "আপনি কোনো টাকাওয়ালার কাছে টাকার জন্য যাবেন না।" ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশিষ্ট চাঁদা যেন না হয়। আপনারা তো আহলে ইল্ম। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) বলেছেন لايحل مال امرئ الا بطيب نفسه কোনো মুসলমানের মাল সন্তুষ্টচিত্ত ছাড়া হালাল হবে না। কোনো মালদার/টাকাওয়ালার কাছে আপনি মুহতামিম সাহেব, বড় মুহাদ্দিস সাহেব ও বড় আলেম গেলেন বা আপনার মাদরাসার সাধারণ উস্তাদ গেলেন, পরিমাণে তারতম্য হবে না তো?

☆ বলেন, আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করলাম। মালওয়ালারা টাকা নিয়ে মাদরাসায় আসার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন হারদুয়ী হযরত (রহ.)। বললেন, ফজরের পর সূরা ইয়াসীনের আমল করো। জুহরের পর খতমে খাজেগান পড়ো। আসরের পর বিশেষ তিন সুন্নাতের আলোচনা করো ও তেলাওয়াত শোনানোর ব্যবস্থা করো। মাগরিবের পর সূরায়ে ওয়াকিয়া পড়ো আর এশার পর حسبنا الله ونعم الوكيل এর আমল করো। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য "দৈনন্দীন আমল" বইটি দেখুন)

☆ বলেন, আমার অধীনস্ত মাদরাসাসমূহের উলামায়ে কেরামের প্রতি অনুরোধ, আপনারা রমাজান মাসে মসজিদে চলে আসুন। চট্টগ্রামের শোলকবহর মাদরাসার মুহতামিম হওয়ার প্রথম বছর সব উস্তাদদেরকে বললাম, আপনারা সবাই রমাজান মাসে মসজিদে ঢুকে যান। চাঁদা তুলতে হবে না। পুরো রমাজান মাস না পারলে প্রথম ১৫দিন মসজিদে থাকুন আর হিম্মত হলে শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করুন। শেষ ১০ দিন চাঁদা উঠানোর বিশেষ সময়। আপনি দাতাদের বলে দিন আমি ই'তিকাফ করব, তাই চাঁদা হয়ত এখন দিয়ে দিন অথবা রেখে দেবেন। আর আমি ঈদের পর নিয়ে নেব। সুতরাং রমাজানে মসজিদেই ঢুকে পড়ুন। চাঁদা কালেকশন দু'আর মাধ্যমে মসজিদেই করুন। যে সকল দু'আ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিখিয়ে দিয়েছেন তা গুরুত্বসহকারে পড়তে থাকুন।

☆ বলেন, জামিল মাদরাসা বগুড়ার শিক্ষক-কর্মচারী ৮৬জন, ছাত্র সংখ্যা ২৫০০জন। সেখানে ২টি মতবখ তথা রান্নাঘর। ১৬০০জন ছাত্র মাদরাসার বোডিংয়ে খানা খায়। আমার জানামতে বাংলাদেশের কোনো মাদরাসায় ২টি মতবখ নেই। রমাজান মাসে স্থানীয় চাঁদা ১০ লাখ টাকার বেশি হয় না। অথচ ২ কোটি টাকা খরচ। বৈদেশিক সাহায্যও নেই। আগে পাকিস্তান যাওয়া হতো। এই বছর তাও বন্ধ করে দিয়েছি। আসাতিজায়ে কেরামকে বলে দিয়েছি আপনারা সবাই মসজিদে ঢুকে পড়ুন। পুরো রমাজান মাস মসজিদে ই'তিকাফ করার চেষ্টা করুন।

☆ বলেন, যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁদের মাঝে এ আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করুন। শওক ও আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে "মালফূজাতে আকাবের।" তাই আকাবেরের বাণী সম্বলিত কিতাব বিশেষ করে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর آپ بیتی পড়ার চেষ্টা করুন।

☆ বলেন, বেতন না নেওয়ার হিম্মতের জন্য দু'আ করতে থাকুন। "আকাবেরগণের" বেতন না নেওয়ার আলোচনা করতে থাকুন। নবুওয়াতের পূর্বে যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক বিবি অর্থাৎ হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন তখন ব্যবসা করেছেন। অথচ মাদানী জীবনে যখন এক সাথে নয়জন বিবি ছিল তখন ব্যবসা করেননি। কর্জ করেছেন। তবে কর্জ নিয়ে নবীজি দুনিয়া থেকে যাননি। নবীজি সাহাবীগণকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন বিনিময় গ্রহণ করেননি। বরং বলেছেন, বিনিময় তো আল্লাহর কাছ থেকেই পাব। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবেতাবেঈন থেকে আমাদের আকাবের পর্যন্ত কেউ বেতন নেননি। তাই দু'আ করতে থাকুন বেতন নিতে না হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য।

☆ বলেন, হারদূয়ী হযরত (রহ.) জামি'আতুল আবরারের উস্তাদ হওয়ার চারটি শর্ত দিয়েছেন। ১. বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী হতে হবে। ২. ইত্তিবায়ে সুন্নত তথা সার্বিক জীবনে সুন্নতের অনুসরণ এবং এর জযবা থাতকে হবে।৩. খেদমতের জযবা ও আবেগ থাকতে হবে। ৪. শরয়ী পর্দার এহতেমাম করতে হবে। হযরত ওয়ালা বলেন, জামি'আতুল আবরারের এখন সপ্তম বছর চলছে। কোন উস্তাদের বেতন নির্দিষ্ট নেই। স্বয়ং হিসাব রক্ষকও জানে না কার বেতন কত? মোট টাকার অংকটিই শুধু জানেন। উস্তাদদের হাদিয়া দেওয়া হয়। কোনো সময় বেশী, কোনো সময় কম। আবার গণনা না করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বেতন না হওয়ার কারণে কারো পক্ষ থেকে এপর্যন্ত কোন অভিযোগও করতে হয় নি। বরং যাদেরকে বিভিন্ন কারণে অন্য মাদরাসায় পাঠানো হয়েছে তাদেরকেও পুনরায় জামি'আতুল আবরার আসার জন্য ব্যাকুল হতে দেখা গেছে।

☆ বলেন, ১৯৭২ সালে শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) এর সাথে হযরতের খানকায় ই'তিকাফ করেছিলাম। সেখানে দেখলাম উলামায়ে কেরামের বিশাল জমায়েত। হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) তাদের মেহমানদারী করছেন। অথচ হযরত (রহ.) মাদরাসা থেকে বেতনও নিতেন না। তখন আমি মনে মনে দু'আ করেছিলাম হে আল্লাহ! এরকম পরিবেশ বাংলাদেশেও করে দাও।

গ্রন্থনায় :

মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান

“সিরাতে মুস্তাকীম” বা সরলপথ

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

বর্তমানে আহলুল হাদীস নামে এক শ্রেণীর বন্ধু মাযহাবের নিরাপদ গণ্ডিতে কুরআন হাদীস চর্চাকারীদের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। ‘মাযহাব মানা কুফরী’, ‘কুরআন হাদীসের মাঝে মাযহাবের দেয়াল কেন? তাদের এ-জাতীয় অবিবেচনাপ্রসূত কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রচারণায় জনসাধারণের মধ্যে অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়িত। উম্মতের প্রথম সারির মুজতাহিদ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফুকাহা, সুলাহা কেউই তাদের বিষোদগার থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তাদের সর্বাপেক্ষা বেইনসাফী বরং বিদ্বেষের শিকার হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ‘হানফী মাযহাব’ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানীফা নূমান ইবনে সাবিত (রহ.)। উম্মতের ঈমান আমলের মুহাফিয হক্কানী উলামায়ে কেরাম দলিল প্রমাণ বলে তাদের সকল আপত্তি-অভিযোগ নিস্পত্তি করে যাচ্ছেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মাযহাব পালনের ব্যাপারে কুৎসা রটিয়ে, মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে ধর্মপ্রাণ সরলমনা জনসাধারনকে তারা প্রতারিত করেই চলছে। উম্মতকে এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মাযহাব অনুসরণের হাকীকত ও ইমামুল মাযহাব আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রকৃত মর্যাদা পাঠকের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক লিখিত ধারাবাহিক লেখাটা প্রকাশের প্রয়াস পাচ্ছি। (আল-আবরার পরিবার)

‘রব’ আল্লাহ তা’আলার গুণবাচক নাম। আদি-অন্ত সর্বগুণের ধারক সত্তা হিসেবে অধীনস্তের উপযোগিতা বিবেচনা করতঃ যিনি তাকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌঁছান তিনিই রব। উল্লেখ-অযোগ্য বস্তু থেকে সৃষ্ট বনী আদমকে শক্ত-সামর্থ্যপূর্ণ মানবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তিনি যেমন রব, বাধা-বন্ধহীন দায়ভারমুক্ত মানুষকে বিধি-নিষেধের আওতাধীন করার ক্ষেত্রেও তিনি রব। সে মতে মানবজাতির ক্রমবিকাশ অনুযায়ী ‘রব্বুন নাস’, আল্লাহ তা’আলা যুগে যুগে আইন স্বরূপ কিতাব ও রিজাল প্রেরণ করেছেন। কিতাবুল্লাহ বর্ণিত আইন বিশ্লেষণ করে এর ব্যবহারিক দিকটি মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন রিজালুল্লাহ। এভাবেই সায়্যিদুনা শীস আলাইহিস সালাম থেকে সর্বযুগে শরীয়তে ইলাহী পালিত হয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত হিসেবে নবীজি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে কুরআনুল আযীম। ইরশাদ হচ্ছে:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম। (সুতরাং) এ দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পালন করো।

(তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, সূরা মায়িদা-৩)

কুরআনুল আযীমে আল্লাহ তা’আলা কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানবজাতির দ্বীনি সকল সমস্যার সমাধান বাতলে দিয়েছেন। কোনোটি স্পষ্টভাবে সবিস্তারে, কোনোটি সংক্ষেপে মূলনীতি আকারে। এদিকে মানুষের স্বভাব চরিত্র, রুচি-বৈশিষ্ট্য অভিন্ন নয়। স্থান কাল পাত্র ভেদে তার সমস্যাবলিও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করতে হবে সরল পথ সীরাতে মুস্তাকীম। এজন্য উদ্ভূত সমস্যা নিরসন কল্পে তাকে কুরআন ও তার ব্যাখ্যা সুন্নাহ থেকে জেনে নিতে হবে। আল্লাহর আইন-ইসলামী শরীয়তের উৎস কী কী? যেন এর আলোকে সে খুঁজে নিতে পারে কাঙ্ক্ষিত মানযিল।

আল্লাহর আইন-ইসলামী শরীয়তের উৎস:

ইসলামী শরীয়তের উৎস তথা দলিল চারটি।

১. কুরআনুল কারীম। ২. সুন্নাহ। ৩. ইজমা। ৪. কিয়াস।

সংক্ষেপে এগুলোর পরিচয় ও প্রমাণ তুলে ধরা হলো।

১. কুরআনুল কারীম :

কুরআন সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখতে হবে।

ক. কুরআন আল্লাহ তা’আলার কালাম। মানব রচিত গ্রন্থ নয়। কুরআনের অনুরূপ একটি গ্রন্থ, নিদেন পক্ষে এর ছোট্টতম সূরার সমমানের একটি সূরা

প্রণয়নে মানুষের অক্ষমতাই এ কথার প্রমাণ। চৌদ্দশ বছর পেরিয়ে গেছে, কুরআনের সাহিত্য-সুষমা, শিল্পগুণ, অর্থ-মর্ম ও ভাব-ব্যঞ্জনার আদলে একটি আয়াতও আজ পর্যন্ত কেউ গড়তে পারেনি। এ বিষয়টিই কুরআন অসীম শক্তিধর সত্তা আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার প্রমাণ।

খ. কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত ইসলামের প্রধান দলিল। বিষয়টি চৌদ্দশ বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সরাসরি শ্রবণ ও আত্মস্থ করার দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। হঠকারিতার বশতঃ দুপুরের তেজোদীপ্ত সূর্যকেও অস্বীকার করা যেতে পারে কিন্তু এ বাস্তবতাকে শত্রু-মিত্র অস্বীকার করতে পারে না। (বিস্তারিত জানতে আল ওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ পৃষ্ঠা ২৬, তাকবীমুল আদিল্লাহ পৃষ্ঠা ২০)

২. সুন্নাহ :

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ। উম্মতের উদ্দেশ্যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। যারা কুরআন মেনে নিয়েছে তারা সুন্নাহ মানতেও বাধ্য। কারণ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ও কর্ম অনুসরণের নির্দেশ এসেছে। সাহাবায়ে কেরামসহ গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত যে, সুন্নাহ ইসলামের দ্বিতীয় পর্যায়ের দলীল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা সুন্নাহর অনুসরণ উম্মতের অবশ্য কর্তব্য এ-সম্পর্কিত কুরআনের কয়েকটি আয়াত-

এক.

اطيعوا الله واطيعوا الرسول

তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (সূরা তাগাবুন ১২)

দুই.

ما اتاكم الرسول فخذوه ومانهٰكم عنه فانتهوا

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো আর যা কিছু থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর ৭)

তিন.

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى

"হে নবী! মানুষকে বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো। (সূরা আলে ইমরান ৩১)

(বিস্তারিত জানতে হুজ্জিয়াতে হাদীস পৃষ্ঠা ১৫-২০)

৩. ইজমা :

ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় পর্যায়ের দলিল ইজমা। ইজমা হলো, উম্মতে মুহাম্মদীর সত্যনিষ্ঠ মুজতাহিদগণের একই যুগে কোনো কথা বা কাজের ওপর ঐকমত্য পোষণ করা। (নূরুল আনওয়ার পৃ: ২১৯) ইজমা তার যাবতীয় শর্তসহ সংঘটিত হয়ে গেলে তার অনুসরণ ওয়াজিব। বিরোধিতা নাজায়িয ও গোমরাহী। (আল ওয়াজিয-পৃষ্ঠা ৫২)

ইজমা শরীয়তের দলিল হওয়ার প্রমাণ :

<u>কুরআনের ভাষ্য:</u>

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء ت مصيرا۔

"যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।" (সূরা নিসা ১১৫)

আয়াতে কারীমায় "মুমিনদের পথ" অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এটাই ইজমা। আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, ইজমা শরীয়তের দলিল, এর বিরোধিতা করা হারাম। বিষয়টি অনেক চিন্তাভাবনা করার পর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এই আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/৪৬০)

হাদীসের আলোকে ইজমা :

উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ইজমা শরীয়তের দলিল এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অর্থগত দিক থেকে মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। উদাহরণত:

لاتجتمع امتى على ضلالة আমার উম্মত গোমরাহীর ওপর একমত হবে না। (জামে তিরমিযী হাদীস নং ২১৬৭)

এ-জাতীয় বহু হাদীস সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে ইজমা শরীয়তের দলিল।

সাহাবাযুগে ইজমা :

সকল সাহাবা (রা.) ইজমাকে শরীয়তের দলিল মনে করতেন। সাহাবাযুগে ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত কয়েকটি মাসআলা উল্লেখ করা হলো।

ক. নাতি-নাতনির মীরাস থেকে দাদির এক ষষ্ঠমাংশ পাওয়া।

খ. যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত কোনো অবস্থায়ই তরক না করা।

গ. এক বোনের ইদ্দত চলাকালীন তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে অপর বোনের বিবাহ অবৈধ হওয়া।

ঘ. বিশুদ্ধ নির্জনবাসের দ্বারা মহর

আবশ্যক হওয়া। ইত্যাদি। (নূরুল আনওয়ার পৃষ্ঠা ২২২)

এ-জাতীয় আরো অনেক মাসআলা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

(বিস্তারিত জানতে আলমাহসুল ফী ইলমিল উসূল ২/৩৪, কাওয়াতিল আদিল্লাহ ফিল উসূল পৃ. ৪৬১)

৪. কিয়াস :

শরীয়তের চতুর্থ দলিল কিয়াস। কিয়াসের শাব্দিক অর্থ অনুমান করা, পরিমাপ করা। পরিভাষায় : যে বিষয়ের বিধান কুরআন হাদীস বা ইজমাতে সুস্পষ্টভাবে নেই সেটাকে কুরআন, হাদীস বা ইজমায় বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধান সংবলিত অনুরূপ কোনো বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তার বিধান বের করা। উভয় বিষয়ে বিধানের কারণ এক হওয়ার কারণে। (আল ওয়াজীয পৃ. ৫৬)

কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

কুরআনের আলোকে কিয়াস :

কুরআনের অনেক আয়াত দ্বারা কিয়াস সাব্যস্ত হয়। সূরায়ে হাশরের দুই নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী গোত্র বনী নযীরের অশুভ পরিণতির কথা আলোচনা করার পর বলেছেন,

فاعتبروا ياولى الابصار

"হে চক্ষুষ্মানেরা! নিজেদের অবস্থা এদের সঙ্গে পরিমাপ করো।" (এবং শিক্ষা গ্রহণ করো)

আয়াতে কারীমার তাফসীরে আল্লামা মাহমূদ আলূসী (রহ.) বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম এই আয়াত দ্বারা কিয়াসকে শরীয়তের দলিল সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে ই'তিবার এর নির্দেশ দিয়েছেন। ই'তিবার মানে অতিক্রম করা, এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর দিকে যাওয়া। কিয়াসের মধ্যেও হুবহু এই ব্যাপারটি পাওয়া যায়। কারণ কিয়াস অর্থই হল মূলের বিধানকে শাখার ওপর আরোপ করা। (তাফসীরে রূহুল মা'আনী ১৫/৫৯)

এ ছাড়া সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত এবং সূরা ইয়াসীনের ৭৯ নং আয়াত দ্বারাও কিয়াস সাব্যস্ত হয়। (বিস্তারিত দেখুন আলওয়াজীয ফী উসূলিল ফিকহ পৃ: ৫৯)

সুন্নাহর আলোকে কিয়াস :

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী স্বয়ং নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কিয়াস করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামগণকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন।

একবার রমাজান মাসে হযরত উমর (রা.) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা কেমন? নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, রোযা অবস্থায় তুমি যদি কুলি করো এতে কোনো সমস্যা হয় কি? হযরত উমর (রা.) বললেন, না তা তো হয় না। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে পেরেশান হচ্ছো কেন?

দেখা যাচ্ছে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহবাসের চুম্বনকে পান করার ভূমিকা কুলির ওপর কিয়াস করেছেন এবং কুলির দ্বারা রোযা ভঙ্গ না হওয়ার বিধানকে বীর্যপাতহীন চুম্বনের ওপর প্রয়োগ করেছেন। (আল মুহাররার ফী উসূলিল ফিকহ ২/১০১ ও আলওয়াজীয পৃ: ৬০)

ইজমার আলোকে কিয়াস :

উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও অনেক ক্ষেত্রে কিয়াস করে শরয়ী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু কোনো একজন সাহাবীর পক্ষ থেকেও এর বিরোধিতা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাহাবাযুগের কিয়াসের দৃষ্টান্ত :

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকালের পর খলিফা নির্বাচন প্রসঙ্গে অনেক সাহাবীই খেলাফতকে ইমামতে সালাতের ওপর কিয়াস করে হযরত আবুবকর (রা.)কে মনোনীত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন

رضيه رسول الله لديننا فلا نرضى لدنيانا

"নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দ্বীনি ব্যাপারে তাঁকে পছন্দ করেছেন, আমরা কি আমাদের দুনিয়াবী ব্যাপারে তাঁকে পছন্দ করব না।

উল্লেখ্য, এই কিয়াস পেশ করা হয়েছিল গণ্যমান্য সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে। কিন্তু কেউ তা দলিল নয়, বলে প্রত্যাখ্যান করেননি। অতএব সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতেও কিয়াস শরীয়তের দলিল সাব্যস্ত হলো। (বিস্তারিত জানতে আলওয়াজীয পৃ: ৬০, তাকবীমুল আদিল্লাহ পৃ: ২৭৮)

সুতরাং অধুনা যেসব মুসলমান ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়তের দলিল মানতে চাননা, তাদের ভুল সিদ্ধান্ত পরিহার করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার দিকে ফিরে আসা ঈমানী দায়িত্ব। যাতে আহলে হকের বিরোধিতার কারণে আখেরাতের আযাবের সম্মুখীন হতে না হয়। (আমীন)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

কোয়ান্টাম মেথড-৪

পবিত্র কুরআন বিকৃতির অভিনব কৌশল

মুফতী শরীফুল আ'জম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের মাঝে রদবদলের ঘটনা মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যার সূচনা ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম আগমনের বহুপূর্বে এই আসমানি কিতাবদ্বয় সংযোজন-বিয়োজনের শিকার হয়ে তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলে। এক দল অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রীদের অন্যায় হস্তক্ষেপের দরুনই এই করুণ পরিণতির শিকার হয় আসমানি এই কিতাবদ্বয়।

পবিত্র কুরআনে তাদের এই অপকর্মের স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

"অতএব তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

ইহুদী খৃষ্টান পণ্ডিতগণ আসমানি কিতাবের মাঝে যে বিকৃতি সাধন করে তা মৌলিকভাবে চার ধরনের। ক. শব্দ সংযোজন। খ. শব্দ বিয়োজন। গ. শব্দ পরিবর্তন। ঘ. অর্থ পরিবর্তন। (বাইবেল সে কুরআন তক ২/১৩)

পবিত্র কুরআন যা সর্বশেষ আসমানি কিতাব তা এ-যাবৎ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয়েছে। অন্য সব কিতাবের মতো এখানেও বিকৃতি সাধনের নানা অপচেষ্টা যুগে যুগে হয়ে আসছে। কিন্তু একটি অক্ষর বা যের যবর পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি। আজ চৌদ্দশত বছর যাবৎ পবিত্র এই কিতাব আদ্যোপান্ত হুবহু সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কারো সাধ্য নেই যে, এর এক অক্ষর ভুল তেলাওয়াত করবে। তৎক্ষণাৎ বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

বাদশাহ মামূনুর রশীদের যুগে এক ইহুদী পণ্ডিত ছিল। হস্তলিপিতে তার প্রসিদ্ধি ছিল। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে চড়া মূল্যে বিক্রি করত। একবার সে বিভিন্ন ধর্ম যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন প্রতিটির তিনটি করে কপি লিপিবদ্ধ করল এবং এগুলোর মাঝে নিজের পক্ষ থেকে কিছু বেশকম করে দিল। এরপর তাওরাত ও ইঞ্জিলের কপিগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছে নিয়ে গেলে তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কিনে নিল। আর মুসলমানদের কাছে কুরআনের কপিগুলো নিয়ে গেলে তারা এতে বেশকম লক্ষ্য করে ফেরত দিল। এই ঘটনা দেখে সে নিশ্চিত হলো যে, একমাত্র কুরআনই সংরক্ষিত আছে। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল। এই পার্থক্যের একমাত্র কারণ হচ্ছে কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন গ্রহণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

"আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর ৯)

পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জিল হেফাজতের দায়িত্ব ইহুদী ও খৃষ্টান আলেমদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। তারা এতে খেয়ানত করেছে বিধায় আজ ওই সকল গ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (সূরা মায়েদা ৪৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)

আজ বিশ্বের কোথাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মূল হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষার তাওরাত ও ইঞ্জিলের একটি কপিও বিদ্যমান নেই। মূল পাঠ বাদ দিয়ে ভাষান্তর ও মর্মবাণী প্রচার-প্রসারের কারণে এই ভয়াবহ বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বেলায়ও বিভিন্ন যুগে ইসলাম দুশমনদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ করা হয়েছে। কুরআন বিকৃতির অপচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে শিয়া সম্প্রদায়। কুরআনের মাঝে তারা বিভিন্ন আয়াত ও সূরা সংযোজন করেছে। আবার অনেক আয়াত বাদ দিয়েছে। বিভিন্ন আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েছে। যার বিশদ বিবরণ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) রচিত 'তুহফায়ে ইছনা আশারিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে তাদের সকল চক্রান্ত আল্লাহর হুকুমে ভেস্তে গেছে। যুগে যুগে উলামায়ে হক্ব তার দাঁতভাঙা জবাব দিয়ে উম্মতের ঈমান আমল হেফাজত করে এসেছেন।

এ ছাড়া যুগে যুগে বহু নামধারী ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআনের তাফসীর ও অনুবাদের বিকৃতি সাধনের চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগেও তাফহীমুল কুরআন নামে বিকৃত তাফসীর কোনো কোনো মহলে প্রচলিত আছে। উক্ত তাফসীরের বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যাসমূহ চিহ্নিত করে লেখা 'মওদূদী কী তাফসীর ওয়া নজরিয়াত পর ইলমী ওয়া তাহকীকী জায়েযাহ' 'মওদূদীর তাফসীর ও চিন্তাধারা' নামে গ্রন্থটি পড়ে বিস্তারিত জানা যেতে পারে।

অতীতের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলাম দুশমনেরা বর্তমানেও কুরআন বিকৃতির

অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করে চলছে। বিভিন্ন ছদ্মরূপ ধারণ করে মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে ইসলামকে ধ্বংস করার নিত্যনতুন ফন্দি করে যাচ্ছে। জীবন বদলে দেওয়ার স্লোগান নিয়ে প্রায় দুই যুগ ধরে কোয়ান্টাম মেথড এ দেশে নীরবে-নির্বিঘ্নে বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। অশান্ত মনে প্রশান্তি আনতে মেডিটেশন (বৈজ্ঞানিক ধ্যান) চর্চার নামে বিভিন্ন মনগড়া মতাদর্শ শিক্ষা দিয়ে চলছে। তাদের নানামুখী তৎপরতা দেখে জনমনে সন্দেহ না জেগে পারে না। নিরাময়ের সাথে ধর্ম তত্ত্বের কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা বোধগম্য নয়। একযোগে সকল ধর্মগ্রন্থের মর্মবাণী প্রচারের উদ্দেশ্য কী, তাও অস্পষ্ট।

কোয়ান্টাম প্রথম দিকে বেদ কণিকা, বাইবেল কণিকা, ধম্মপথ কণিকা, কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকা নামে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচনা করে। এ সকল পুস্তিকায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের কিছু মর্মবাণী প্রচার করা হয়। কিছুদিন এভাবে চলার পর বিষয়টি গা-সওয়া হয়ে গেলে সব কয়টি পুস্তিকা একত্র করে কণিকাসমগ্র/ কোয়ান্টাম কণিকা নামে প্রকাশ করা হয়। এভাবে সহজে মুসলমানদের ঘরে ঘরে বেদ-বাইবেলের মর্মবাণী পৌঁছে যেতে থাকে। ধর্মের ব্যাপারে উদাসীন মুসলমানগণ কোনো বাছ-বিচার ছাড়া তা পাঠ করে মোহিত হয়ে যায়। ফলে ইসলামের সাথে সাথে অন্য সব ধর্মকেও সত্য ও পালনীয় বলে বিশ্বাস করতে চায়। অপরদিকে কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকায় মর্মবাণী রচনার নামে আয়াতও হাদীসের মূল আরবী পাঠ বাদ দিয়ে বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুবাদ করে দেওয়া হয়। অনেকটা এক গুলিতে দুই শিকারের মতো ব্যাপার। একদিকে সকল ধর্মের স্বীকৃতি, অপরদিকে কুরআন হাদীসের বিকৃতি।

আজকের আলোচনায় শুধু কুরআন বিকৃতির কিছু নমুনা কোয়ান্টাম কণিকা থেকে তুলে ধরা হলো।

কোয়ান্টাম কণিকা গ্রন্থের একেবারে শেষের দিকে স্থান পেয়েছে কুরআন কণিকা। যার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আল-ফাতেহার অনুবাদ। এখানে প্রথমে সূরায়ে ফাতিহা ও তার সঠিক অনুবাদ উল্লেখ করা হলো এর পর কোয়ান্টাম কণিকার সূরা ফাতেহার অনুবাদ হুবহু উল্লেখ করা হবে এবং বিকৃতির ধরণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ-

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين☆ الرحمن الرحيم☆ مالك يوم الدين☆ اياك نعبد وايا ك نستعين☆ اهدنا الصراط المستقيم☆ صراط الذين انعمت عليهم☆ غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔

"১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচারদিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদের সরল পথ দেখাও। (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।" (মাআরিফুল কুরআন পৃষ্ঠা ১)

কোয়ান্টামের অনুবাদ–

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক হে আল্লাহ তোমারই জন্য। তুমি দয়াময়! মেহেরবান! প্রতিদান দিবসের মালিক! আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই। প্রভু হে! বিভ্রান্ত ও অভিশপ্তদের অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। প্রভু হে! তোমার প্রিয়জনদের সহজ-সরল আলোকিত পথে আমাদের পরিচালিত করো। আমীন। (সূরা ফাতেহা)

সূরা ফাতেহার এই অনুবাদে বিকৃতির ধরনসমূহের বিবরণ :

এক. "বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক"

رب العالمين এর এই অনুবাদ করা হলে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বকে খাটো করা হয়। কেননা عالم শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যাতে সকল মাখলূকাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে 'বিশ্বজাহান' বলতে শুধু পৃথিবীর এই জগতকে বোঝায়। নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধান "মিসবাহুল্লুগাত"এ عالم শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে ساری مخلوق। সে হিসেবে বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "মাআরিফুল কুরআনে"-এর অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে।

"যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।"

ইমাম রাজী (রহ.) তাফসীরে কবীরে লিখেছেন যে, এই সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগৎ রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ও এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সকল বস্তুই আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে। (মাআরিফুল কুরআন ১/৭১)

তাই শুধুমাত্র "বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক" অনুবাদটি যে, ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাতে সন্দেহ নেই।

দুই. "হে আল্লাহ" বাক্যটি আহ্বান সূচক। যাকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় ندا (নেদা) বলা হয়। الحمد لله এর অনুবাদে এভাবে আহ্বান করে "হে আল্লাহ" বলার অবকাশ নেই। যেহেতু তা আহ্বান সূচক বাক্য নয় বরং তা جمله خبريه (উদ্দেশ্য ও বিধেয়)। যার সঠিক তরজমা হচ্ছে– "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।" (মাআরিফুল কুরআন পৃ:২)

অতএব "হে আল্লাহ" অনুবাদটি ভুল।

তিন. "তোমারই জন্য" বাক্যটি সম্বোধন সূচক। যা মূলত حاضر তথা মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। অথচ لله বাক্যে কোনো রূপ সম্বোধন নেই। বরং এখানে غائب তথা নামপুরুষ

ব্যবহার করা হয়েছে। যার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে– "আল্লাহ তা'আলার জন্য।" অতএব "তোমার জন্য" অনুবাদটি ভুল।

চার. "তুমি দয়াময়! মেহেরবান! প্রতিদান দিবসের মালিক!" এখানে সূরায়ে ফাতেহার দুই ও তিন নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে। এতে 'তুমি' বলে حـــاضـــر তথা মধ্যমপুরুষ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে উক্ত আয়াতদ্বয়ের মাঝে غـــائـــب তথা নামপুরষের ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে– "যিনি নিতান্ত মেহরবান ও দয়ালু, যিনি বিচার দিনের মালিক।" তাই এখানে حـــاضـــر তথা মধ্যমপুরুষ ব্যবহার করে অনুবাদ করা ভুল।

পাঁচ. পবিত্র কুরআনের অন্যতম অলৌকিকতার নির্দশন হচ্ছে নিপূণভাবে বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োগ। এরই ধারাবাহিকতায় সূরা ফাতেহার প্রথম তিন আয়াতে غـــائـــب তথা নামপুরুষ ব্যবহার করে পরবর্তী আয়াতসমূহে خطاب তথা সম্বোধনসূচক বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। ইলমে বালাগাত তথা আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে–

الالتـفـات من الغيبة الى الخطاب বলা হয়। (আল ইতকান ২/১৮৬)

যা উচ্চমানের সাহিত্যিকতার পরিচায়ক ও ভাষার সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টামের অনুবাদে পবিত্র কুরআনের এই সাহিত্যপূর্ণভাব, অলৌকিক শব্দশৈলী ও অনন্য গাঁথুনিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। যা কুরআন বিকৃতির একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত। সঠিক অনুবাদ হবে এভাবে–

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক।"

এই তিন আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে غـــائـــب তথা নামপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরের আয়াতের অর্থ: "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি....." এখান থেকে কথার ধরন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলাকে এখন সরাসরি সম্বোধন করে حـــاضـــر তথা মধ্যমপুরুষ ব্যবহার শুরু হয়েছে। গুণকীর্তনের পর মাওলার সাথে বান্দার যেন সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। আর সরাসরি কথোপকথন আরম্ভ হয়ে গেছে। তাই কুরআনের এই বিশেষ বচনভঙ্গি অনুসরণ করে অনুবাদ না করা হলে তা বিকৃত অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ছয়. "প্রভু হে!" শব্দটি দু'আয়াতের শুরুতে দু'বার আনা হয়েছে। অথচ মূল আয়াতে এমন আহ্বান সূচক কোনো শব্দ নেই যার অর্থ "প্রভু হে!" দ্বারা করা যেতে পারে। অতএব এই শব্দটি কুরআনের মাঝে সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত। আসমানি কিতাব বিকৃতির যে চারটি পন্থা শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে এ ধরনের শব্দ সংযোজন তার অন্যতম।

সাত. "অন্ধকার গহ্বর থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর" অনুবাদের এ অংশটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। মূল আয়াতে এমন কোনো শব্দ নেই যার অর্থ 'অন্ধকার গহ্বর' ও 'রক্ষা কর' হতে পারে। মনগড়া একটি বাক্য কোয়ান্টামের পক্ষ থেকে সূরায়ে ফাতেহায় সংযোজন করা হয়েছে। যা চরম ধৃষ্টতার শামিল।

আট. "আলোকিত" শব্দটি الـمستـقيـم শব্দের অনুবাদ হতে পারে না। কারণ الـمستـقيـم অর্থ সরল। তাই আলোকিত শব্দটি এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আনা হয়েছে। এবং এর দ্বারা কোন্টামের বাতলানো পথ ও মতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কোয়ান্টাম কণিকা গ্রন্থের শুরুতেই লেখা আছে 'আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র।' আর সূরায়ে ফাতেহার অনুবাদে এসে সেই আলোকিত শব্দটি প্রয়োগ করে কী বোঝানো হয়েছে তা কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

নয়. কোয়ান্টামের কুরআন কণিকায় সূরায়ে ফাতেহার শেষ তিন আয়াতের অনুবাদ আগে-পরে করে লিখা হয়েছে। সপ্তম আয়াত- ولا غير المغضوب عليهم الضالين এর অনুবাদ আগে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াত اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم এর অনুবাদ পরে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ যে ধারাবাহিকতায় সাজানো রয়েছে তা হুবহু যথাক্রমে রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। আয়াতকে আগপিছ করা মারাত্মক গোনাহ। হাফেজ সুয়ূতী (রহ.) বর্ণনা করেন–

وقال القاضى ابو بكر فى الانتصاف: ترتيب الآيات امر واجب وحكم لازم فقد كان جبرئيل يقول : ضعوا آية كذا فى موضع كذا

"আয়াতসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব ও বাধ্যতামূলক। কেননা জিবরাঈল (আ.) স্বয়ং বলে দিতেন যে, অমুক আয়াত অমুক স্থানে রাখুন।" (আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ১/১৩৫) সূরায়ে ফাতেহার শেষ তিন আয়াতের ধারাবাহিক ও বিশুদ্ধ অনুবাদ হচ্ছে

اهدنا الصراط المستقيم "আমাদের সরল পথ দেখাও।"

صراط الذين انعمت عليهم "সে সমস্ত লোকের পথ যাদের তুমি নেয়ামত দান করেছ।"

غير المغضوب عليهم ولا الضالين "তাদের পথ নয় যাদের প্রতি তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।"

এখানে الصراط المستقيم এর দু'টি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। ক. صراط غير المغضوب .খ الذين انعمت عليهم عليهم ولا الضالين-

তাই বিশুদ্ধভাবে এর অনুবাদ করতে হলে উভয় বিশেষণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ কোয়ান্টামের অনুবাদে এর কোনো তোয়াক্কা করা হয়নি।

দশ. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব বিকৃত হওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে যে বিষয়টি তা হচ্ছে, যে ভাষায় কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার عبارت তথা মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ ভাবার্থ বা সারমর্ম প্রকাশ করা। এরপর আবার সে ভাবার্থ ও সারমর্মকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এভাবে মূল কিতাব একসময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে মনগড়া কাটছাঁটের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ কারণে পবিত্র কুরআনের মূল আরবী আয়াত বাদ দিয়ে শুধু তার অনুবাদ প্রকাশ নাজায়েয। কোয়ান্টাম এ নীতিমালা ভঙ্গ করে কোয়ান্টাম কণিকায় সূরা ফাতেহাসহ বিভিন্ন সূরা হতে অসংখ্য আয়াতের শুধু অনুবাদ প্রকাশ করেছে। সেখানে মূল আয়াত উল্লেখ না থাকায় অনুবাদে ব্যাপক বিকৃতি সাধন সহজ হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের এই কুরআন কণিকা ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হলে কী ভয়াবহ বিকৃতি সাধিত হবে, তা সহজে অনুমেয়। তাওরাত ইঞ্জিলের মাঝে বিকৃতি সাধন এ পথেই করা হয়েছে। অতএব সময় থাকতে সাধু সাবধান। কোয়ান্টাম কণিকা হতে আরো কিছু আয়াতের অর্থ বিকৃতির নমুনা পেশ করা হলো।

মূল আয়াত	বিশুদ্ধ অনুবাদ	কোয়ান্টামের বিকৃত অনুবাদ
الله لا اله الا هو الحى القيوم (ال عمران ٢)	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব সব কিছুর ধারক।	আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (হুকুমদাতা) নেই, তিনি শাশ্বত ও চিরঞ্জীব।(আলে ইমরান-২)
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ☆ الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا☆ (الجن ٢٦–٢٧)	তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোণীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।	গায়েব ও ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র তিনিই জানেন, যদি না তিনি কাউকে জানান, যেমন তিনি রসূলদের জানিয়েছেন। (জ্বিন ২৬-২৭)
والله خير الرازقين (جمعه ١١)	আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।	আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা। (জুমআ ১১)
قد افلح المؤمنون (مؤمنون/١)	মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।	বিশ্বাসীরা অন্তরে পবিত্র। (মুমিনুন : ১)
يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة (بقره ٢٠٨)	হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।	হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরোপুরি সমর্পিত হও। (বাকারা ২০৮)
ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه (حجرات ١٢)	তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে?	তোমরা গীবত বা পরনিন্দা করো না। গীবত করা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সমান অপরাধ। (হুজরাত ১২)
لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى (بقره ٢٥٦)	দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।	ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই, আলোর পথ এখন সুস্পষ্ট। (বাকারা ২৫৬)
ومن احسن قولا ممن دعاا لى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين (حم ٣٣)	যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?	সে ব্যক্তিই উত্তম, যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং ঘোষণা করে যে, আমি আল্লাতে সমর্পিতদের একজন। (হামীম : ৩৩)
ان مع العسر يسرا ☆ فاذا فرغت فانصب☆ والى ربك فارغب (انشراح ٦–٨)	নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।	নিশ্চয়ই কষ্টের পরে রয়েছে স্বস্তি ও সাফল্য। অতএব নিশ্চিন্ত মনে পরিশ্রম করুন। আপনার প্রতিপালকের মহিমা স্মরণ করুন। (ইনশিরাহ ৬-৮)
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون (انبياء ٩٤)	অতপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি।	বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্মে নিয়োজিত হলে তার প্রতিটি প্রয়াস আমি লিখে রাখি এবং সে তার প্রয়াসের প্রতিদান পাবে। (আম্বিয়া : ৯৪)

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও করণীয়

মুফতী জাফর আলম আনওয়ার কাসেমী

ঈদ কী?

ঈদ (عيـــد) শব্দের অর্থ হলো আনন্দ-উৎসব। প্রাচীন কাল থেকেই আরবে-আজমে সকল সম্প্রদায় ও গোত্রের বার্ষিক বিশেষ দিনে সাম্প্রদায়িকভাবে আনন্দ-উৎসব পালন করা হতো। সে দিন ওই সম্প্রদায় নিজেদের সকল দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে সকলে একত্রিত হয়ে সাজগুজু ও আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠত। সকল সম্প্রদায়েরই এ ধরনের নির্দিষ্ট একটি দিন থাকত। আর বাস্তবে এটি একটি মানবিক চাহিদাও বটে। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের এই মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য দুটি দিনকে তাদের আনন্দের দিন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একটি হলো 'ঈদুল ফিতর' আর অপরটি হলো 'ঈদুল আযহার' দিন।

হাদীস শরীফে এসেছে : যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ আনলেন, তখন মদীনাবাসীরা বছরের নির্দিষ্ট দুটি দিনে খেলাধুলা ও উৎসব করত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এই দুটি দিন কিসের দিন? তাঁরা বললেন: এই দিনে আমরা জাহিলিয়্যাতের যুগে উৎসব করতাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই দুই দিন অপেক্ষা উত্তম দুটি দিন তোমাদের উৎসবের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাহলো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন।" (আবু দাউদ শরীফ১/৬৭৫ হা: ১১৩৪)

অপর এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা ঈদের দিন ইরশাদ করেন, ان لكل قوما عيدا وهذا عيدنا "প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নির্দিষ্ট একটি উৎসবের দিন রয়েছে, আর আজ আমাদের উৎসবের দিন।"(বুখারী শরীফ ১/২৮৮ হা: ৯৫২)

তবে মুসলমানদের উৎসব অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসবের ন্যায় শুধুমাত্র খেলাধুলা ও জাহিলিয়্যাতের রীতিনীতি পালন করাই নয়। এ কারণেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনার জাহিলিয়্যাতের ওই দুটি দিনকে পরিবর্তন করে নতুন দুটি দিনের ঘোষণা করেন। যাতে মানুষ ঈদ বলতে কেবল খেল-তামাশা ও জাহিলিয়াতের পুরাতন রীতিনীতি না বোঝে। বরং মুসলমানদেরকে তাদের মানবিক চাহিদা অনুযায়ী ঈদের দিন সুসজ্জিত হওয়া ও একত্রিতভাবে আনন্দ করার পাশাপাশি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু হুকুম-আহকামও আরোপ করা হয়েছে। যাতে তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় শুধু খেল-তামাশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে এবং মুসলমান যাতে আনন্দের অতিশয্যে আল্লাহকে ভুলে না যায়। বরং তাদের একত্রিত হওয়া যেন ধরায় আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার জন্যই হয়।

ঈদুল ফিতরের হাকীকত :

মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার হুকুমে অবিচ্ছিন্নভাবে দীর্ঘ এক মাস রোযার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক কোরবানি দিয়ে থাকে। ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদি সহ্য করে। শেষ রাতে উঠে সাহ্‌রী খায় রাতভর তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে রত থাকে। আর এই কষ্ট ইত্যাদি সহ্য করার পর মানবিক চাহিদা ইহাই যে, একটু সময় কিছু আনন্দ-উৎসব করা হোক। সাথে সাথে একটি মাস আল্লাহ তাআলা তাঁর এবাদত-বন্দেগিতে কাটানোর সুযোগ দিয়েছেন, তাই এর সমাপ্তির পর আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন ও তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করা উচিত। আর এই শুকরিয়া জ্ঞাপন করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা রমাজানের পর একটি দিন দান করেছেন। আর ইহাই ঈদের দিন। যাতে আনন্দ-উৎসব করবে এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করবে। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون-

"যাতে তোমরা (রোযার শেষে) আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।" (সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫)

ঈদুল ফিতরের ফযীলত :

হযরত আউস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "যখন ঈদুল ফিতরের দিন আগত হয়, তখন পথে পথে ফেরেশতাগণ দণ্ডায়মান হন এবং এ আওয়াজ দিতে থাকেন : হে মুসলমানগণ! তোমরা এমন দয়ালু প্রভুর রহমতের দিকে অগ্রসর হও, যিনি উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এবং সর্বোত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করে থাকেন। তোমাদেরকে রাত্রিবেলা নামায পড়ার আদেশ করা হয়েছিল, তোমরা নামায পড়েছ। আর দিনের বেলা রোযার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা রোযা রেখেছ। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের পুরস্কার গ্রহণ করো। আর যখন মানুষ ঈদের নামায আদায় করে, তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন যে, হে সকল লোক! তোমাদের প্রভু তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমরা সঠিকভাবে তোমাদের ঘরে ফিরে যাও, কেননা এটি পুরস্কারের দিন। আর এ দিনটিকে

আসমানে পুরস্কারের দিন হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। (আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী:১/২২৬ হা: ৬২৭)।

অন্য হাদীসে হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : "যখন ঈদুল ফিতরের দিন হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা রোযাদারদেরকে নিয়ে ফখর করতে থাকেন এবং বলেন : হে আমার ফেরেশতাগণ! তাদের আমলের কি প্রতিদান হতে পারে। তাঁরা বলেন : তাদের প্রতিদান হলো এর ছওয়াব দান করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : হে ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা-বান্দিগণ আমার পক্ষ থেকে ফরযকৃত রোযা আদায় করেছে, অতঃপর তারা আমার নিকট প্রার্থনা করার জন্য বের হয়েছে, আমার ইজ্জত, আমার বড়ত্ব, আমার সম্মান, আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমার উচ্চ মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করব। অতঃপর বলেন : তোমরা ফিরে যাও তোমাদের গোনাহসমূহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেন, তখন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাবে। (শুআবুল ঈমান, বাইহাকী : ৩/৩৪৩ হা: ৩৭১৭)

ঈদুল ফিতরের দিনের আমলসমূহ :

ঈদুল ফিতরের দিন বিশেষভাবে আমলযোগ্য ১১টি আমল রয়েছে :

এক. উত্তমরূপে গোসল করা। দুই. মেসওয়াক করা। তিন. উত্তম কাপড় পরিধান করা। চার. সুগন্ধি ব্যবহার করা। পাঁচ. সকাল বেলা বেজোর সংখ্যা খেজুর বা যে কোনো মিষ্টান্ন খাবার খাওয়া। ছয়. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে সাদকাতুল ফিতর আদায় করা। সাত. হেঁটে সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া। আট. রাস্তায় চলাকালীন নিম্নস্বরে তাকবীর বলা। নয়. অতিরিক্ত ছয় তাকবীরসহ দুই রাকআত নামায জামা'আতের সহিত আদায় করা। দশ. ঘরে ফেরার সময় যাওয়ার বিপরীত রাস্তায় আসা। এগার. সারা দিন বেশি বেশি তাকবীর, তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ করা।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানগণকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ঈদ পালন ও অনর্থক খেল-তামাশা ও রীতিনীতি পালন করা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

কৈফিয়ত

সমসাময়িক কিছু লেখাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ধারাবাহিক কয়েকটি লেখা এই মাসে ছাপানো সম্ভব হয়নি।

নির্বাহী সম্পাদক

(৪৪ পৃষ্ঠার পর)

তদসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর। মারকায, জামিয়াতুল আবরার, জামিল মাদরাসা বগুড়া, শুলকবহর মাদরাসা চট্টগ্রাম, মদীনাতুল উলূম মাদরাসা বসুন্ধরা, ঢাকা, আশরাফিয়া মাদরাসা গাজীপুর, মারকাযুল ইকতিসাদ বসুন্ধরা ঢাকাসহ সংশ্লিষ্ট সকল মাদরাসার ছাত্র শিক্ষক ভগ্নহৃদয়ে দু'আ করতে থাকেন হযরত মুফতী সাহেব হুজুরের জন্য। এদিকে মুহিব্বীনদের অনেকে তাঁদের পরিবারকে নিয়ে দু'আতে বসে যান আপন আপন ঘরে।

পায়ের অপারেশন :

পর দিন সকাল থেকেই ডাক্তারগণ হুজুরের পা অপারেশনের সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু হুজুরের হাই ডায়াবেটিসের কারণে অপারেশন করা সম্ভবই হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলার লাখো শোকর দুনিয়া ব্যাপী এই দু'আ ও কান্না আল্লাহ তা'আলার কাছে নিশ্চয়ই কবুল হয়েছে, তৃতীয় দিনই হুজুরের সফল অপারেশন সম্পন্ন হয়। হাসপতালে ভর্তির দশ দিনের মাথায় হুজুরকে হাসপাতাল থেকে মারকাযে নিয়ে আসা হয়। তবে যেহেতু হাড্ডির বিষয় চিকিৎসা দীর্ঘদিন চালাতে হবে।

দূর্ঘটনা কবলিত গাড়ী :

হুজুর যে গাড়ীতে ছিলেন তা ছিল প্রাডো। সংঘর্ষের মাত্রা ছিল এতই প্রচণ্ড, সামনের ইঞ্জিনসহ পুরো সাইট ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সামনের ছাকাগুলো থেতলে গেছে। হুজুর ছিলেন সামনের সিটে। যে কোন ব্যক্তি গাড়ীটি দেখে বিশ্বাসই করতে পারছিল না এই গাড়ীর যাত্রীরা বেঁচে আছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিজের কুদরতী হস্তেই হুজুরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বর্তমানে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বরাকাতুহুম) কে ই'তিকাফ করতে আসা সালেকীনের জামা'আত এবং তাদরীব নিতে আসা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মসজিদে বেশ কবার ইসলাহী বয়ান করতে দেখা গেছে এবং তাদরীবের কোর্সেও যেতে দেখা গেছে। যদিও আগের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করতে পারছেন না।

দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন হুজুরকে পুরোপুরি সুস্থতা ফিরিয়ে দেন এবং দীর্ঘ হায়াতে তায়্যিবা দান করেন। আমীন

উল্লেখ্য উক্ত মর্মান্তিক ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন মাওলানা মনীর সাহেব, শিক্ষক মদীনাতুল উলূম মাদরাসা বসুন্ধরা ঢাকা। হুজুরের ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর পায়ের হাড্ডিও ভেঙ্গে গিয়েছিল। অপারেশন এবং সুষ্ঠু চিকিৎসার পার বর্তমানে তিনিও সুস্থের পথে রয়েছেন।

এক বার্তায় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং দেশ বিদেশের আলেম উলামা, মুহিব্বীন, ভক্ত-অনুরক্ত এবং পরিচিতজনদের শোকরিয়া আদায় করেন। ব্যাপক ভাবে হুজুরের খোঁজ খবর রাখায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সকলের জন্য দু'আ করেন।

উপমহাদেশে কুরআনে করীমের অনুবাদ

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

'কুরআন' 'মানুষ' ও 'ভাষা' মূলত একই সূত্রে গাঁথা। কুরআন হলো পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির একমাত্র সনদ। বিশ্বমানবতার শান্তির একমাত্র রাহবার। শুধুমাত্র উম্মতে মুসলিমাহ নয়, বরং পৃথিবীর সকল মানুষের কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, "রমাজান মাস, যে মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন মানুষের জন্য হেদায়াত স্বরূপ"। (সূরা : ২ বাক্বারাহ) আর মানুষই হলো এ পৃথিবীর আসল মেহমান। মানব জাতি নামক মেহমানদের পথনির্দেশক হলো আল-কুরআন। এই কুরআনকে বুঝে আমল করার জন্য এবং অপরকে বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন ভাষাজ্ঞান। এ ভাষাজ্ঞান মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠদান। সূরা আর-রাহমানে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন,

"তিনি(আল্লাহ) দয়াময়। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। শিক্ষা দিয়েছেন তাকে বয়ান।" বয়ান বলতে কথা বলার ক্ষমতা, ভালো এবং মন্দের পার্থক্য জ্ঞান, কুরআন বর্ণনা করার ক্ষমতা তথা তেলাওয়াত করা ও হিফয করার ক্ষমতা, কুরআনের বিষয়বস্তু তুলে ধরে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষমতা, অনেক ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা ইত্যাদি। (ইবনে কাসীর, আলূসী, রুহুল মা'আনী) এখানে কুরআন শিক্ষা, মানব সৃষ্টি ও ভাষাজ্ঞান এই তিনটি বিষয় একত্রে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বোঝাতে চান : তোমাকে দয়া করে কুরআন শিখিয়েছেন আল্লাহ। কুরআন বোঝার একমাত্র উপযোগী জীব মানুষ হিসাবে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এবং বিশ্বময় বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ।

মাতৃভাষায় কুরআন চর্চা :

ভাষা আল্লাহর দান। আর মাতৃভাষা আল্লাহর সেরা দান। ইসলামে এর মর্যাদা তুলনাহীন। মাতৃভাষার গুরুত্ব তুলে ধরে মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকট সে জাতিরই নিজস্ব ভাষায় একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "আমি সব রাসূলকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষি করে প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে।"(সূরা ইব্রাহীম, আয়াত ৪) আসমানি কিতাব যেহেতু মানব জাতির মুক্তির সনদ, তাই এর ভাব-ভাষা যাতে সহজে অনুধাবন করা যায় সেজন্য এ কিতাবগুলো স্বগোত্রীয় ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড, যাতে করে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।" (সূরা হাদীদ, আয়াত ২৫)

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, হযরত মুসা (আ.)-এর স্বগোত্রীয় ঈসরায়ীলীদের মাতৃভাষা ছিল হিব্রু। তাই তার প্রতি তাওরাত নাযিল হয় হিব্রু ভাষায়। হযরত দাউদ (আ.)-এর স্বগোত্রীয়দের মাতৃভাষা ইউনানী ভাষায় নাযিল হয় যবুর। হযরত ঈসা(আ.)-এর স্বগোত্রীয়দের মাতৃভাষা আরামীয় ভাষায় নাযিল হয় ইঞ্জিল। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর মাতৃভাষা ছিল আরবী। তিনি যেখান থেকে দাওয়াতের সূচনা করেছিলেন সেই আরববাসীদের মাতৃভাষাও ছিল আরবী। তাই রাসূল (সা.)-এর প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ হয় তার ভাষাও আরবী। মহান আল্লাহ বলেন : "আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন রূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত ২)

আল-কুরআন যদি আরবী ভাষায় নাযিল না হয়ে অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো, তাহলে আরববাসীরাই সর্বপ্রথম এর বিরোধিতায় নেমে পড়ত। তারা বলত, আমরা হলাম আরবীভাষী আর কুরআন নাযিল হল অন্য ভাষায়? তাহলে আমরা একে বুঝব কিভাবে! অন্তর্যামী মহান আল্লাহ এ কথাটাই বর্ণনা করেছেন এভাবে : "আমি যদি অনারব ভাষায় কুরআন নাযিল করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? আশ্চর্য, কিতাব অনারব ভাষায় আর রাসূল হলেন আরবীভাষী।"(সূরা হামীম সাজদাহ, আয়াত ৪৪) তাই, মাতৃভাষায় কুরআন চর্চা করা কুরআনেরই দাবি। তবে কুরআনের ভাষায় পারদর্শী বিশেষজ্ঞ উলামাদেরকেই এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। আরবী ভাষার সাথে সম্পর্কহীন শুধু বাংলায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ বিশেষজ্ঞ উলামাদের সংস্পর্শ ছাড়া বাংলায় কুরআন চর্চা করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুরআনের মূলভাব ও মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হবেন। তাই, বিশেষজ্ঞ উলামাদের সংস্পর্শ ছাড়া মাতৃভাষায় কুরআন চর্চা করার বিকল্প কোনো পথ নেই। কেননা, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের সাথে একজন রাসূলও পাঠিয়েছেন কুরআন বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম অনুবাদক :

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহাবায়ে কেরাম জান বাজি রেখে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গোটা পৃথিবীতে ইসলামের সুশীতল ছায়া বিস্তার লাভ করে। সাহাবায়ে কেরাম যে সব স্থানে গমন করেন, তাঁদের সাথে

সাথে আল-কুরআনও সেখানে পৌঁছে যায়। সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাথে আল-কুরআন যেসব এলাকায় পৌঁছে সে সব এলাকায় কুরআনের বদৌলতে আরবী ভাষা এক পর্যায়ে মাতৃভাষার সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে আল-কুরআনের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুমতিক্রমে হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর স্বদেশবাসী নওমুসলিমদের জন্য সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার ফারসী অনুবাদ করেন। (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৬৭২)

অমুসলিম কর্তৃক প্রথম অনুবাদ :

কুরআনুল কারীম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তাই প্রত্যেকের জন্য উহা বুঝা এবং উহার ওপর আমল করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই ছিল সাহাবায়েকেরামের অনুবাদের উদ্দেশ্য। অপর দিকে অমুসলিম জাতির ধর্মযাজকগণ সাধারণত কুরআনুল কারীমকে নিজে বোঝার জন্য এবং তাদের স্বজাতির মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণার বীজ বপনের জন্য বিভিন্ন ভাষায় কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করেছেন। পাশ্চাত্য ভাষায় কুরআনুল কারীমের প্রথম অনুবাদ হয় নেতৃস্থানীয় পাদ্রী Peter Abbot of Cluny-এর নির্দেশ ক্রমে। ইংল্যান্ডের এক পণ্ডিত Robertus Retennesis ল্যাটিন ভাষায় ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত করেন।(সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৬৭২)

প্রথম যেদিন ছাপাখানায় মুদ্রণ হলো :

সর্বপ্রথম ১১১৩ হিজরী/১৭০১ঈসাব্দ সালে জার্মানির হামবুর্গ থেকে আল-কুরআন পূর্ণ আরবীতে মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রিত আল-কুরআনের একটি কপি 'দারুল কিতাবিল আরাবিয়া' মিসরের কায়রোতে সংরক্ষিত আছে। পাশাপাশি এ কথাও বর্ণিত আছে যে, ৯২২হিজরী/১৫১৬ ঈসাব্দের পর ইতালির ভেনাস শহরে আল-কুরআন সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়েছিল।(সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৪৮৭)

উপমহাদেশে আল-কুরআনের প্রথম অনুবাদ : উপমহাদেশের উস্তাযুল আসাতিযা, ইলমে হাদীসের মারজাউল আসানীদ, হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রা.) সর্বপ্রথম এই উপমহাদেশে ফার্সি ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ করেন 'ফতহুর রহমান' নামে ১১৫০ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৯ ঈসাব্দে। তারপর তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল কাদের মুহাদ্দিসে দেহলবী(রা.)-এর উর্দু ভাষায় পারিভাষিক অনুবাদ 'মুযিহুল কুরআন' নামে প্রকাশ পায় ১২০৫ হিজরী মোতাবেক ১৭৯০ ঈসাব্দে। তা ছাড়াও শাহ রফীউদ্দিন (রা.)-এর উর্দু ভাষায় শাব্দিক অনুবাদও মৌলিকত্বের দাবি রাখে। (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৩)

বাংলা ভাষায় প্রথম আল-কুরআনের অনুবাদ :

বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের ৩০তম পারার সর্বপ্রথম কাব্যানুবাদ করেন উত্তরবঙ্গের রংপুর জিলার মটকপুর নিবাসী মো. আমিরুদ্দীন বসুনিয়া। এটি প্রকাশ পায় ১৮০৮ ঈসাব্দে।

আল-কুরআনের গ্রহণযোগ্য টিকাসহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ :

১৮০৮ ঈসাব্দে আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদের সূচনা হয়। চলতে থাকে আল-কুরআনের খণ্ডিত অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিক রচনা। সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের গ্রহণযোগ্য টিকাসহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন টাঙ্গাইলের সুরুজগ্রাম নিবাসী মাওলানা মুহম্মদ নঈমুদ্দীন (জন্ম : ১৮৩৩, মৃত্যু : ১৯০৮ ঈসাব্দ)। গ্রন্থটির প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন মীর আতাহার আলী করটিয়া। প্রকাশকাল ১৮৮৭ ঈসাব্দ। মাহমুদিয়া প্রেস, করটিয়া থেকে প্রকাশিত।

বাংলা ভাষায় ইংরেজ খৃস্টান কর্তৃক প্রথম অনুবাদক :

রেভারেন্ড এইচ জি রাউস নামক এক খৃস্টান মিশনারির পুরোধা ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে'ফুরকান' নামে আল-কুরআনের অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিল কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাস্টের ব্যবস্থাপক। মুদ্রক ছিল রোভারেন্ড জি ডব্লিউ টমাস। ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত। এদের উদ্দেশ্য ছিল আল-কুরআনকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইসলামের বিরুদ্ধে সুগভীর চক্রান্ত করা।

গিরিশচন্দ্র সেন আল-কুরআনের প্রথম অনুবাদক নন :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদের সূচনা হয় ১৮০৮ ঈসাব্দে মো. আমিরুদ্দীন বসুনিয়ার হাতে। এরপর অনুবাদকের তালিকায় নাম আসে শায়ের গোলাম আকবর আলীর নাম। তিনি ১৮৬৮ ঈসাব্দে ৩০তম পারার অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর একই বছর 'কুরআন কালামুল্লাহ ও খাওয়াসসুল কুরআন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন খন্দকার মীর ওয়াহিদ আলী। তারপর নাম আসে ১৮৭২ ঈসাব্দে নাসিরুদ্দীন আহমদ-এর। তিনি রচনা করেন 'নিয়ামা-ই খুদা' নামক একটি গ্রন্থ। তারপর নাম আসে ১৮৭৮ ঈসাব্দে 'ক্বারী নাসিরুদ্দীন ও মুহম্মদ হানিফ'-এর। তিনি রচনা করেন 'যীনাতুল ক্বারী বা কুরআন পাঠের রীতি' একটি গ্রন্থ। তারপর অমুসলিমদের মাঝে প্রথম নাম আসে 'রাজেন্দ্রনাথ মিত্র'-এর। তিনি ১৮৭৯ ঈসাব্দে সূরা বাক্বারাহ পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ করেন। এরপর ১৮৮১ ঈসাব্দে নাম আসে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের। (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৪)

স্মরণ
সাহাবী জীবন

ইসলামের তৃতীয় খলীফা

হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয় :

নাম : ওসমান, উপনাম : আবু আব্দিল্লাহ, ও আবু ওমর, উপাধি: যুন্ নূরাইন, পিতার নাম: আফ্‌ফভনা, মাতার নাম আরওয়া, বংশ : কুরাইশ, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফাত ভাই এবং জামাতা, প্রথমে হযরত রুকাইয়া (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয় তাঁর ইন্তিকালের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অন্য এক কন্যা উম্মে কুলসূম (রা.)-এর সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। সে কারণেই তাঁর উপাধি অর্জিত হয় "যুন্ নূরাইন" তথা দুই নূরবিশিষ্ট। তিনি প্রসিদ্ধ হস্তির ঘটনার ষষ্ঠ বছর তথা হিজরতে মদীনার ৪৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। (১)

ইসলামের পূর্বে তিনি (আরববাসীর নিয়মের বিপরীত) শিক্ষার্জন করেন। এবং যৌবনে পদার্পণ করার পর থেকেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হন। সততা এবং আমানতদারীর কারণে তিনি ব্যবসায় অস্বাভাবিক উন্নতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ :

তাঁর চৌত্রিশ বছর বয়সে যখন মক্কানগরীতে ইসলামের ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করেন একপর্যায়ে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে তিনি ইসলাম গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ হন। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য মনস্থ করলেন, ঠিক সে সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই সেখানে উপস্থিত হন এবং হযরত ওসমানকে দেখে বললেন: ওসমান! আল্লাহর জান্নাত কবুল করো। আমি তোমার এবং সমস্ত মাখলূকের হিদায়াতের জন্য প্রেরিত হয়েছি। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যবান মুবারক থেকে উল্লিখিত বাণী উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আমার যবান থেকে উচ্চারিত হয়

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

এভাবে তাঁর দস্তমুবারকে হাত দিয়ে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। (২)

হিজরত :

তিনি প্রথমে রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পরামর্শে সপরিবারে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিছুদিন পর কুরাইশের ইসলাম গ্রহণের ভুল খবর শুনে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ এলে তিনিও সপরিবারে মদীনায় হিজরত করেন।

জিহাদ ও যুদ্ধাভিযান :

মদীনায় মুসলমানদের হিজরতের পর থেকে বিধর্মীদের সাথে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং জিহাদ সংঘটিত হয়। প্রায় সবকটিতে তিনি বীর মুজাহিদ হিসাবে শরীক ছিলেন। শুধুমাত্র বদরের যুদ্ধে তাঁর স্ত্রী তথা রাসূলে আকরাম (সা.) এর সাহেবযাদী হযরত রুকাইয়া (রা.) মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য রাসূল (সা.) তাঁকে মদীনায় থাকতে বলেন। এবং তাঁর মন যেন ছোট না হয় তিনি এ সুসংবাদ ও শুনিয়ে দিলেন যে, জিহাদে শরীক হওয়ার সওয়াব ও গণীমতের মাল উভয়টিতে তোমার অংশ থাকবে। (৩)

ওসমানী কীর্তি :

তাঁর শাসন আমলে জনকল্যাণমূলক বহু কার্যাদী আঞ্জাম দেওয়া হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(১) বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের জন্য ইমারত নির্মাণ।

(২) জনকল্যাণের জন্য সড়ক, সেতু, মুসাফির খানা এবং মসজিদ নির্মাণ।

(৩) বন্যার ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য বাঁধ নির্মাণ ও নদী খনন ।

(৪) মসজিদে নববীর পুণঃনির্মাণ এবং প্রশস্তকরণ।

(৫) নৌ বাহিনীর ব্যবস্থাপনা।

(৬) কুরআন মজীদকে ইখতিলাফ এবং বিকৃতি থেকে রক্ষা করে তার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা ইত্যাদি । (৪)

স্বভাব চরিত্র :

হযরত ওসমান (রা.) স্বভাবগতভাবে সৎ, পরহেযগার, আমানতদার এবং সত্যবাদী ছিলেন। লজ্জা এবং নম্রচিত্ত তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। অন্ধকার যুগে যখন আরবের প্রত্যেক ব্যক্তি মদ্যপানে মত্ত ছিল তখনও তিনি একাজ থেকে বিরত থাকতেন। যখন পৃথিবীজুড়ে মিথ্যা অপবাদ খুন খারাবি এবং অশ্লীল কাজের ধুমধাম ছিল তখনও তাঁর পূতপবিত্রতা এসব ময়লা-আবর্জনা দ্বারা আপবিত্র হয়নি। (৫)

ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুহবত এসব গুণাবলিকে আরো চমৎকার করে দেয়। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বিশেষ গুণাবলি উল্লেখ করা হলো :

খোদাভীতি :

খোদাভীতি হলো সকল সৎগুণাবলির

মূল। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, তার থেকে কোনো নেক কাজের আশা করা যায় না, হযরত ওসমান (রা.) অধিকাংশ সময় আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকতেন। সব সময় মৃত্যু, কবর এবং আখেরাতের স্মরণে বিভোর থাকতেন, তাঁর সামনে দিয়ে কোনো মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়ে গেলে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত, কবরস্থান দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। জিজ্ঞাসা করা হলো : জাহান্নামের আলোচনা এলে আপনি এত কান্নাকাটি করেন না, কিন্তু কবরস্থান দেখলে যে আপনি অস্থির হয়ে যান এবং কান্নাকাটি করেন, তার কারণ কী?

উত্তরে তিনি বলতেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : "কবর হলো আখিরাতের প্রথম ঘাঁটি, যদি এ ঘাঁটি সহজে পার হওয়া যায়, তাহলে বাকি সব ঘাঁটি সহজে পার হওয়া যাবে। আর যদি এ ঘাঁটি কঠিন হয় তাহলে সব ঘাঁটি কঠিন হবে।" (৬)

হায়া ও লাজুকতা :

হাদীস শরীফে আছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

الحياء شعبة من الايمان

"হায়া ঈমানের একটি বিশেষ শাখা" (৭)

হায়া মানুষের এমন একটি গুণ, যা দ্বারা সে গোনাহ এবং মানবতাবিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। এই হায়া হযরত ওসমান (রা.)-এর বিশেষ গুণ হিসাবে প্রসিদ্ধ। এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর হায়ার প্রতি লক্ষ রাখতেন, এক সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামের এক মজলিসে বসা ছিলেন, সঙ্কোচহীনতার কারণে তাঁর উরুমুবারকের কিছু অংশ অনাবৃত ছিল। এমতাবস্থায় হযরত ওসমান (রা.) এর আগমনের খবর শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাবৃত অংশ ঢেকে ফেললেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন : "ওসমানের হায়ার কারণে ফেরেশতারা ও হায়া করেন।" (৮)

ইত্তিবায়ে সুন্নত :

তিনি সব কাজে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতেন। বর্ণিত আছে একবার তিনি অজু করার সময় মুচকি হাসি দিলেন, এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : রাসূল (সা.) ও একবার অজু করার সময় এভাবে মুচকি হাঁসি দিয়েছিলেন। আরেকবার তাঁর সামনে দিয়ে লাশ নিয়ে গেলে তিনি দাঁড়িয়ে যান। এবং বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও এভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন। আরেকবার আসরের সময় সবার সমনে অজু করে দেখালেন এবং বললেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে আজু করতেন। (৯)

বিনয় নম্রতা : তাঁর বিনয়ের অবস্থা এমন ছিল যে, ঘরে প্রচুর পরিমাণে গোলাম বাঁদী থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায় সময় নিজের কাজ নিজ হাতেই সম্পাদন করতেন রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন কেউ জাগ্রত না হলে নিজেই অজুর ব্যবস্থা করতেন। এ কাজের জন্য কাউকে জাগ্রত করে ঘুমের ব্যাঘাত করা তিনি পছন্দ করতেন না। কেউ তাঁর সাথে কটুভাষায় কথা বললে তিনি বিনম্রভাষায় তার উত্তর দিতেন।

নিঃস্বার্থতা :

তিনি সব সময় মুসলমান এবং জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতেন। তাঁর শাসনামলের বার বছর জীবনে ব্যক্তি গত কাজ বা খরচের জন্য বায়তুল মাল থেকে একটি দানা ও নেননি।

জনগণের খেদমত :

তিনি মদীনায় হিজরত করার পর দেখলেন, মুসলমানগণ পানির তীব্র সংকটে আছেন। শহরে প্রায় কূপের পানি লবণাক্ত হওয়ার কারণে পান করার উপযোগী ছিল না, শুধুমাত্র "বীরে রূমাহ" নামক একটি মিঠাপানির কূপ ছিল। যার মালিক ছিল এক ইহুদী। হযরত ওসমান (রা.) বিশ হাজার দেরহাম দিয়ে কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। তেমনিভাবে তাবুকের যুদ্ধের সময় তিনি প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সহায়তা করেন। (১০)

ধৈর্য ও সহনশীলতা : তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতায় ছিলেন হযরত আইয়ুব আলাইহিস্সালামের প্রতিকৃতি। বিপদাপদ ও দুর্ঘটনা তিনি ধৈর্য ও স্থিরতার সহিত মুকাবেলা করতেন। শাহাদতের প্রাক্কালে তিনি যে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শাহাদত :

১৮জিলহজ্জ ৩৫ হিজরী জুমাবার বিদ্রোহীদের হাতে তিনি কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় নিজ ঘরে শাহাদতবরণ করেন।

হাশ্শে কাউকাব (বর্তমান জান্নাতুল বাকীতে) দাফন করা হয়।

তথ্য সূত্র :

(১) ছিয়ারুস্সাহাবাহ ১/১৭৫
(২) প্রাগুক্ত ১/১৭৬
(৩) সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড হযরত ওসমান (রা.)-এর ফযীলত অধ্যায়।
(৪) সিয়ারুস্সাহাবাহ ১/ ২২৩-২৩২
(৫) কাঞ্জুল উম্মাল ৬/ ৩৭২
(৬) মুসনাদে আহমদ ১/৬৩
(৭) সহীহে বুখারী ঈমান অধ্যায়
(৮) প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড ওসমান (রা.) এবং ফযীলত অধ্যায়
(৯) মুসনাদে আহমদ ১/৫৮
(১০) মেছালী হুকমরাঁ ৯৮।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : হাজারী রোযা

মুহাম্মদ আব্দুর রহমান

দেবপুর, মাছুয়াখালী, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

জিজ্ঞাসা :

অনেক মানুষ রজব মাসের ২৭ তারিখের রোযাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এটি হাজারী রোযা বলে বিশ্রুত আছে। অর্থাৎ হাজার রোযার ছওয়াব মনে করা হয় এবং এই বিশ্বাসেই রোযা রাখা হয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কী?

সমাধান :

রজব মাসের হাজারী রোযার শরীয়তে ভিত্তি নেই। (ইবনে মাজাহ ১২৫, ফতাওয়া দারুল উলূম ৬/২৯১, ফতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/১৩৩)

প্রসঙ্গ : কাজা রোজা

মাওলানা ফেরদাউস

খতীব, শ্রীমঙ্গল কোট মসজিদ

মৌলভীবাজার, সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক মহিলা রমাজান মাসে হায়েযের কারণে রোযা রাখতে পারেনি। যার ফলে সে শাওয়াল মাসে কাজা করে। এবং সাথে সাথে শাওয়ালের নফল ছয় রোযার নিয়্যাত করে। আমার জানার বিষয় হলো ফরজের সাথে সাথে নফলের ফজীলত পাবে কি না?

সমাধান :

রমাজানের ছুটে যাওয়া রোযাগুলো ফরজ। আর ফরজ রোযার সাথে নফল রোযার নিয়্যাত মিলানোর কোনো অবকাশ নেই। (উমদাতুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী ১/২০৪, আহসানুল ফতাওয়া ৪/৪৪১, আযীযুল ফতাওয়া ১/৩৯২)

প্রসঙ্গ : রোযা

মুহাম্মদ ছমির উদ্দীন

উখিয়া, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

আমার শারীরিক দুর্বলতার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দিনের বেলায় অধিক পরিমাণে পানি খেতে হয়। পানি না খেয়ে আমি থাকতে পারি না। এখন আমার জানার বিষয় হলো আমার জন্য রোযা না রেখে তার ফিদিয়া দেওয়া বৈধ হবে কি না? আমার কিছু রোযা কাজাও আছে। এর জন্য ফিদিয়া দেওয়া বৈধ হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

রমাজান মাসে রোযা পালন করা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হুকুম। তাই একান্ত অপারগতা ছাড়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর ওপর রমাজান মাসে রোযা রাখা ফরজ। বিধায় আপনি রোযা রেখে দিনের সূচনা করে রোযা পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। তবে রোযা রাখা অবস্থায় অধিক পিপাসার কারণে প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলে রোযা ভেঙে পরবর্তীতে কাজা করে নিতে হবে। ফিদিয়া দিলে তা আদায় হবে না। তদ্রুপ কাজা রোযাও রোযার মাধ্যমে আদায় করতে হবে। শীতকালের ছোট দিনে তা সহজে আদায় করা যায়। তবে একেবারে অপারগ হয়ে গেলে ফিদিয়া আদায় করার অবকাশ আছে। কিন্তু ফিদিয়া আদায়ের পর মৃত্যুর পূর্বে রোযা রাখতে সক্ষম হলে ওই রোযাগুলো পুনরায় কাজা করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/৪২১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৯৩, শরহুননেকায়া ৪২৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬৫, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৪/১৯২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬/৪৭০)

প্রসঙ্গ : তারাবীহর নামায

আতীকুর রহমান

সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

(১) আমরা জানি রমাজান মাসে খতম তারাবীহর নামায পড়িয়ে টাকা দেওয়া নেওয়া জায়েয নেই। এখন যদি ইমাম সাহেব হাফেজ সাহেবকে রমাজান মাসে ওয়াক্তিয়া নামাযের দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র চলে যায় অথবা থেকেও ইমামতি না করে তাহলে এমতাবস্থায় খতমে তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া বা দেওয়া জায়েয আছে কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

সমাধান :

যদি টাকা ছাড়া খতম তারাবীহ পড়ানোর জন্য কোনো হাফেজ পাওয়া না যায় তাহলে কোনো হাফেজকে ইমামের নায়েব হিসেবে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়ানোর দায়িত্ব দিলে সেই ইমামতির বিনিময় হিসেবে ইমামতের যা বেতন তা দেওয়া নেওয়া জায়েয হবে। খতমে তারাবীহর বিনিময় হিসেবে জায়েয হবে না। তবে এমন পন্থা অবলম্বনের অবকাশ থাকলেও তা না করাই উত্তম। (রাদ্দুল মুহতার ৬/৫৬, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৪/৩৮৪)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

জিজ্ঞাসা : (২)

যদি কোনো মসজিদে খতম তারাবীহ পড়ার কারণে কিছু লোক এশার নামাযও মসজিদে পড়তে না আসে, তবে এ অবস্থায় উক্ত মসজিদে খতম তারাবীহ

পড়া বৈধ হবে কি না?

সমাধান :

খতম তারাবীহ সুন্নতে মুআক্কাদা কেফায়াহ। মহল্লার মসজিদে তার ব্যবস্থা না থাকলে মহল্লাবাসী দায়মুক্ত হবে না। তবে মা'যূর বা যাদের কষ্ট হয় তাদের জন্য মসজিদে জমা'আতের সহিত এশার ফরজ আদায় করে ঘরে বা অন্যত্র সূরা তারাবীহ পড়ার অবকাশ আছে। (বাহরুর রায়েক ২/১২০, ফাতাওয়ায়ে উছমানী ১/৪৬৬)

প্রসঙ্গ : তারাবীহে খতমে কুরআন কারীদের হাদিয়া দেওয়া।

মান্দুয়ারা মসজিদ কমিটি

মনোহরগঞ্জ, লাকসাম, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

(১) বর্তমান যামানায় খতম তারাবীহর পরে হাফেজ সাহেবদেরকে হাদিয়ার নামে যে টাকা দেওয়া হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে কি না? বৈধ না হলে বৈধ হওয়ার কোনো পন্থা আছে কি না? এবং হাদিয়া দানকারী মুক্তাদির গোনাহ হবে কি না? চাই তা সূরা তারাবীহ হোক বা খতম তারাবীহ হোক।

(২) দাড়ি ছাটা, বেপর্দা, টিভি দেখনেওয়ালা ইমামের পেছনে নামায পড়া যায়েয হবে কি না? চাই তা তারাবীহ হোক বা ওয়াক্তিয়া নামায হোক।

(৩) নাবালেগ হাফেজের পেছনে তারাবীহ জায়েয হবে কি না? কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

(১) খতম তারাবীহর পর হাদীয়ার নামে হাফেজ সাহেবদের টাকা দেওয়া নেওয়া সবই নাজায়েয। দাতা-গ্রহীতা সকলেই গোনাহগার হয়। তবে অন্যান্য নামাযের মতো তারাবীহর নামাযের ইমামতির বিনিময় নেওয়া জায়েয। (দুররুল মুখতার ২/৭৩, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৭/১৭১)

(২) দাড়ি ছাটা ও প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের কাজে লিপ্ত ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক। ফাসেককে ইমাম বানানো নাজায়েয। (হাশিয়াতুত তাহতাবী ৩০৩, আহসানুল ফতাওয়া ৩/৫১৮)

(৩) নাবালেগ হাফেজের পেছনে তারাবীহ পড়ার অনুমতি নেই। (আলবাহরুর রায়েক্ব ১/৬২৮, কেফায়াতুল মুফতী ৩/৭২)

প্রসঙ্গ : ঈদের ছয় তাকবীর

রফীকুল ইসলাম

বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা জানি ঈদের নামাযে ছয়টি তাকবীর। এই ছয় তাকবীর প্রসঙ্গে শরীয়তের যে দলিল আছে তা সূত্র উল্লেখপূর্বক জানালে আমরা উপকৃত হতাম। কেউ কেউ বলেন ঈদের নামাযের অতিরিক্ত বারটি তাকবীর বলতে হয়। কথাটি শরীয়তের ভিত্তিতে কতটুকু সঠিক?

সমাধান :

যদিও ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর ও বারো তাকবীর উভয়টির কথা হাদীসে আছে, কিন্তু ছয় তাকবীরের হাদীস অধিক সহীহ ও আমলযোগ্য। বিধায় যারা ছয় তাকবীরের হাদীসের ওপর আমল করে আসছেন তাদের আমলটিই বিশুদ্ধ। বিস্তারিত জানতে 'ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর কেন' পুস্তিকাটি দেখতে পারেন। (এ'লাউস সুনান ৮/১০৩, তাহাবী শরীফ ২/৪০০, ফাতহুল মুলহিম ৫/৫৩৫)

প্রসঙ্গ : তারাবীহ

মুহাম্মদ মাসউদুল করীম

টাঙ্গাইল।

জিজ্ঞাসা :

(১) যদি কোনো হাফেজ সাহেব রমাজানে কোনো চুক্তি করা ছাড়া খতম তারাবীহ পড়ায়। আর মহল্লাবাসী পরস্পর চাঁদা উঠিয়ে তাকে হাদিয়া প্রদান করে, তাহলে কি তার জন্য কি এই হাদিয়া নেয়া বৈধ হবে?

(২) যদি কোনো হাফেয কেবল ১ মাসের জন্য পাঁচওয়াক্ত বা তিন ওয়াক্ত ফরজ নামাযের ইমামতি করে পূর্ববর্তী মাসসমূহ অপেক্ষা বেশি টাকা ধার্য করে। অনন্তর এর অধীনে খতমে তারাবীহ পড়িয়ে দেয়। তাহলে এভাবে টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধান :

(১) চুক্তি ছাড়া তারাবীহ পড়ানোর পর হাদিয়া প্রদান মূলত পারিশ্রমিক প্রদানের একটা পদ্ধতি। আর খতমে তারাবীহ পড়িয়ে মেহনত পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয নেই। তাই উক্ত হাফেজ সাহেবের জন্য ওই হাদিয়া গ্রহণ করাও জায়েয হবে না। (রাদ্দুল মুহতার ২/৭৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৫১২)

(২) হাফেজ সাহেব যদি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বা তিন ওয়াক্ত ফরজ নামায পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং খতমে তারাবীহর বিষয়টি ঐচ্ছিক হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার উক্ত ফরজ নামাযের ইমামতির পারিশ্রমিক নিতে অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৪/৩১, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৪/৩৮৪)

প্রসঙ্গ : যাকাত

মুহাম্মদ দ্বীন ইসলাম

নর্দ্দা, বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

যদি কোনো ব্যক্তি যাকাতের টাকা দিয়ে গরু ক্রয় করে উক্ত গরু মাদরাসার এতিমখানায় ছাত্রদেরকে দান করে দেন তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

সমাধান :

যাকাত আদায় হওয়ার জন্য যাকাতের

অর্থ বা বস্তু গরিব-মিসকিনদের মালিকানায় দেওয়া শর্ত বিধায় উক্ত গরু মাদরাসা ছাত্রদের পূর্ণ মালিকানায় দেয়া সঠিক হলে যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় আদায় হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২/২৫৭, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৫০)

প্রসঙ্গ : মসজিদ স্থানান্তরকরণ

মুহাম্মদ মনীরুল হক্ব
চরচারী পাড়া
গৌরিপুর বাজার, দাউদকান্দি,
কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

বিবরণ : আমাদের গ্রামের মসজিদটি এখন যে অবস্থানে আছে এই জায়গার পরিমাণ ৩ শতাংশ। আমরা এখন যে স্থানে মসজিদটি স্থানান্তর করতে চাই ওই স্থানে আমরা ১৫ শতাংশ বা তারও বেশি জায়গা মসজিদের জন্য ব্যবহার করতে পারব। আমাদের বর্তমান মসজিদের অবস্থান গ্রামের ভেতরে। এখন আমরা গ্রামের উত্তর পাশ দিয়ে চলে যাওয়া নতুন রাস্তার পাশে খোলামেলা পরিবেশে মসজিদটি স্থানান্তর করতে চাই। যেখানে আমরা আমাদের মুসল্লিদের কথা চিন্তা করে মসজিদ সম্প্রসারিত করতে পারব। যা মসজিদের বর্তমান অবস্থানে আমাদের মসজিদ ফান্ডে পর্যাপ্ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, আমাদের এই মসজিদটি উপরে উল্লেখিত স্থানে স্থানান্তর করতে পারলে মুসল্লিগণ একটি সুন্দর পরিবেশে ইবাদত করার সুযোগ পাবে। এবং পথচারীগণ খুবই সহজে সালাত আদায় করার সুযোগ পাবে। কারণ এই রাস্তার খুব নিকটে কোনো মসজিদ নেই।

সমস্যা : আমাদের বর্তমান মুসল্লি সংখ্যা অনেক বেশি। তাই নামাযের সময় কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। মসজিদের পাশেই বসতবাড়িঘর অবস্থিত। মসজিদ থেকে ঘরের দূরত্ব ২-৩ হাত। মসজিদের নামায পড়া অবস্থায় মহিলাদের কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়, আবার কখনো কখনো গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যায়। মসজিদের সামনে একটি ঘাট আছে। সেখানে মহিলারা কাজ করে পর্দাহীনভাবে। মসজিদ থেকে ঘাটের দূরত্ব ২-৩ হাত। মহিলারা এখানে গোসল করে, থালা-বাসন ধোয়াসহ অন্যান্য সাংসারিক কাজ করে। মসজিদের দুই পাশে চলাচলের রাস্তা এবং তার মাঝে কোনো দেয়াল বা প্রাচীর নেই।

আমাদের জানার বিষয় হলো : ১. বর্তমানে মসজিদটি যে অবস্থানে আছে স্থানান্তর করার পরে যদি আমরা পুরাতন মসজিদে নামায না পড়ি এতে মহল্লার মানুষের কোনো ক্ষতি হবে কি না? এবং মসজিদের কোনো হক নষ্ট হবে কি না? ২. মসজিদটি নতুন জায়গায় স্থানান্তর হওয়ার পর পুরাতন মসজিদে আমরা নামায ছাড়া মক্তব অথবা অন্য কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করতে পারব কি না? ৩. মসজিদের নামে মাঠে কিছু জায়গা জমি আছে এবং মসজিদে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও ফান্ডে যে টাকা জমা আছে তা নতুন মসজিদের কাজে ব্যবহার করতে পারব কি না?

সমাধান :

শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে কোনো জায়গা একবার মসজিদ সাব্যস্ত হলে তা কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। তা বিক্রি, স্থানান্তর বা পরিবর্তন করা জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাগুলোর কারণে উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না। বরং সমস্যাগুলো দূর করার চেষ্টা করতে হবে। মুসল্লি সংকুলান না হলে মসজিদ সম্প্রসারণ করবে। অথবা বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করবে। তাও সম্ভব না হলে অন্য জায়গায় নতুন মসজিদ স্থাপন করা যাবে। এমতাবস্থায় উভয় মসজিদকে নামাযের মাধ্যমে আবাদ রাখা এলাকাবাসীর ওপর ওয়াজিব। অন্যথায় সবাই গোনাহগার হবে। এবং পুরাতন মসজিদকে নামায বাদ দিয়ে স্থায়ীভাবে মক্তব বা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বানানো জায়েয হবে না। তবে এলাকাবাসী সবাই মিলে পুরাতন মসজিদকে পঞ্জেগানা হিসেবে বহাল রেখে নতুন মসজিদকে পঞ্জেগানা ও জুম'আ মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। পুরাতন মসজিদের প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ ও আসবাবপত্র নতুন মসজিদে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। (আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৫৮, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ৫/৫৭২, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ২/৪৩৭, কেফায়াতুল মুফতী ৭/৪৩, এমদাদুল আহকাম ৩/১৭০, এমদাদুল ফাতাওয়া ২/৬৯৯)

প্রসঙ্গ : যাকাতের অর্থে রাস্তা নির্মাণ

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
গাজীপুর, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমার গ্রামের কোনো এক ব্যক্তির ৫০ হাজার টাকা যাকাত আসে। এখন এই যাকাত দাতা ব্যক্তি চাচ্ছেন যে, উক্ত টাকা দিয়ে এলাকায় রাস্তা নির্মাণ করে দেবেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো উক্ত টাকা দিয়ে এলাকায় রাস্তা নির্মাণ করে দিলে তার যাকাত আদায় হবে কি না?

সমাধান :

যাকাতের টাকা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কোনো গরিবকে বিনা শর্তে ও স্বার্থে মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার আবশ্যকীয় শর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে এ শর্ত পাওয়া না যাওয়ায় যাকাত আদায় হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৪, হাশিয়াতুত্তাহতাবী ১/৪৩৫)

প্রসঙ্গ : হজ্ব

মাও: মুহাম্মদ কুতুবুদ্দীন
শাহজাদপুর, ঈদগাহ মসজিদ
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমরা দশজন হজ্বে গিয়েছিলাম। যখন কুরবানী করার সময় এলো তখন দশজন মিলে অপর একজনকে উকিল বানালাম আমাদের কুরবানী করার জন্য। আমরা টাকাও পরিশোধ করলাম। কিন্তু যাকে উকিল বানালাম সে নিজে তা না করে অপর একজনকে তার নিজের এবং ওই দশজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করার দায়িত্ব অর্পণ করল এবং টাকাও পরিশোধ করল। কিন্তু ওই ব্যক্তি কুরবানী না করে পালিয়ে গেল। এমতাবস্থায় যখন ওই দশজন হাজী সাহেব প্রথম উকিলকে জিজ্ঞাসা করল যে, আমাদের কুরবানীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে কি না? উকিল সাহেব কোনো ব্যবস্থা করতে না পেরে বলে দিল হ্যাঁ, কুরবানী হয়ে গেছে। অতঃপর হাজী সাহেবগণ এহরাম খুলে হজ শেষ করে নিজ নিজ বাড়ি প্রবেশ করেন এবং প্রথম উকিলও তাদের সঙ্গে আসেন।

এখন আমার জানার বিষয় হলো– (১) ওই সকল হাজীর হজ সঠিকভাবে আদায় হয়েছে কি না? (২) প্রথম উকিল জিম্মা থেকে মুক্ত হলো কি না? (৩) যদি মুক্ত না হয়, কোন কাজ করলে পরিপূর্ণ মুক্ত হতে পারবে এবং হাজীদের হজ পরিপূর্ণ আদায় হবে?

বি: দ্র: প্রথম উকিলের কাছে কোনো টাকাও ছিল না যে, সে কুরবানী করে দেবে আর তাদের হজ্ব ছিল হজ্জে তামাত্তু।

সমাধান :

(১) তামাত্তুকারীদের জন্য ইহরাম খোলার আগে ১২ জিলহজ্বের ভেতরে দমে শোকর আদায় করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু তারা কোনোটাই করেনি। বিধায় তাদের হজ্ব পরিপূর্ণ হয়েছে বলা যাবে না। বরং দমের পূর্বে ইহরাম খোলার কারণে দ্বিতীয় দম এবং আয়্যামে নাহারের ভেতর না হওয়ার কারণে তৃতীয় আরেকটি, মোট তিনটি দম প্রতিজন হাজীর জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। (গুনিয়্যাতুল মাসালিক ১৫০, আহসানুল ফতাওয়া ৪/৫৬৮)

(২) প্রথম উকিল দায়মুক্ত হয়নি। (হেদায়া ৭/৯৩ আলা সদরিল ফাতহি, ফতহুল ক্বাদীর ৭/৯৬)

(৩) প্রথম উকিল প্রতিজন হাজীর পক্ষ হতে তিনটি করে দম হেরেমের সিমানার ভেতর দিয়ে দিলে নিজে দায়মুক্ত হবে এবং হাজীদের হজ্বও পরিপূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। অন্যথায় নয়। (বাদায়েউস সানায়ে ৭/৪৩৮, এমদাদুল ফতাওয়া ৩/৩২৫)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মাও: মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম
লাউয়াই জামে মসজিদ
দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের একটি পুরাতন মসজিদের পূর্ব পার্শ্বের খালি জায়গায় ওই মসজিদের বরাবরেই পূর্ব দিকে একটু বেশি জায়গা নিয়ে মসজিদটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বে মসজিদ ছিল ৭ কাতার। তবে মসজিদের ভেতর নতুন জায়গাটির পূর্ব উত্তর কোণে অজুখানা ও মুআযযিন সাহেবের রুম তৈরি করা হয়েছে। এতে পুরাতন মসজিদের তুলনায় পেছনের কাতারগুলো পূর্ব উত্তর কোণে অনেক কমে গেছে।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের পূর্ব কোণে বাহিরে পূর্ব থেকেই উপর তলায় ওঠার সিঁড়ি ছিল। এবং মসজিদটির প্রস্থ প্রায় ৭০ হাত। এ থেকে উত্তর দিকে অজুখানা তৈরি করাতে প্রায় ১২ হাত কমেছে। অতএব আমাদের জানার বিষয় হলো- ক. প্রশ্নের বিবরণ মতে নতুন মসজিদের মধ্যে ওজুখানা ও মুআযযিন সাহেবের রুম তৈরি করা বৈধ হয়েছে কি? খ. পুরাতন মসজিদের তুলনায় নতুন স্থানটিতে পেছনের কাতারগুলো উত্তর দিক থেকে কম হওয়াতে কোনো অসুবিধা হবে কি?

সমাধান :

ক. প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে যদি নতুন মসজিদের পূর্ব উত্তর কোণে মসজিদ বৃদ্ধি করার সময় ওজুখানা এবং মুআযযিন সাহেবের রুম তৈরি করা হয় তাহলে তা বৈধ হবে। পক্ষান্তরে নতুন জায়গাটি সম্পূর্ণ মসজিদ হিসেবে সম্প্রসারণের পর এর কোনো স্থানেই ওজুখানা বা মুআযযিন সাহেবের রুম তৈরি করা হলে তা বৈধ হবে না।

খ. পুরাতন মসজিদের তুলনায় নতুন সম্প্রসারিত স্থানে পেছনের কাতারগুলো অপারগতার কারণে উত্তর দিক থেকে কম হওয়ায় কোনো অসুবিধা হবে না। (দুররে মুখতার ৪/৩৫৮, ফতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/৫৩৮, কেফায়াতুল মফতী ৭/৭১, ৭/২৯, ফতাওয়ায়ে হক্কানিয়া ৫/১২৭)

প্রসঙ্গ : গোবর বিক্রি

আব্দুল ওয়াহাব
শুয়াগঞ্জ, কুমিল্লা।

জিজ্ঞাসা :

গোবর বিক্রি করা এবং তাকে লাকড়ির সাথে মিশিয়ে বা মিশানো ছাড়া জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা জায়েয কি না?

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে গোবর বিক্রয় জায়েয আছে। তেমনিভাবে লাকড়ির সাথে মিশিয়ে হউক বা না মিশিয়ে হউক উভয় অবস্থায় জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৮৫, মাজমাউল আনহুর ২/৫৪৬)

শবে ক্বদর ও ই'তিকাফের তাৎপর্য

মাওলানা রিজওয়ান জমীরাবাদী

শবে ক্বদর :

পবিত্র মাহে রমাজানের নিয়ামতসমূহের মধ্যে শবে ক্বদর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত। এই রাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এই রাতকে বলা হয়েছে হাজার রাতের চেয়ে উত্তম রাত। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এই রাতের এতই ফজীলত বর্ণিত হয়েছে যা থেকে সহজে অনুমান করা যায় পুরো বছরের রাতসমূহে শবে ক্বদরই হলো সর্বোত্তম রাত এবং ইবাদত ও দু'আ কবুল হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সার্বজনীন সুযোগ। তাই এই রাতের গুরুত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এই রাত পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী।

শবে ক্বদরের ফজীলত :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

انا انزلناه فى ليلة القدر☆ وما ادراك ما ليلة القدر☆ ليلة القدر خير من الف شهر☆ تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هى حتى مطلع الفجر (سوة القدر)

"আমরা এই কুরআন ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি, তোমরা কি জান শবে ক্বদর কী? ক্বদরের রাত এক হাজার রাতের চেয়ে উত্তম, এতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ আপন পালনকর্তার অনুমতিতে প্রত্যেক কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়, এটি শান্তিময় (রাত) ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

عن ابى هريرةؓ عن النبى ﷺ قال: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه (بخارى)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে লোক শবে ক্বদরে ঈমানের সাথে ছওয়াবের নিয়্যাতে রাত জাগরণ করবে (রাত জেগে বিভিন্ন ইবাদতে মশগুল থাকবে) তার অতীতের গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

শবে ক্বদর চিহ্নিত করণ :

عن ابى سلمة قال قال رسول الله ﷺ انى اُريت ليلة القدر ثم انسيتها او نسيتها فالتمسوها فى العشر الاواخر فى الوتر- (بخارى)

"আবু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমাকে শবে ক্বদর দেখানো হয়েছিল কিন্তু আমি ভুলে গেছি বা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা তা রমাজানের শেষ দিকের বেজুড় রাত্রসমূহে খোঁজ করো। (বুখারী)

عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال: تحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الاواخر من رمضان (بخارى)

"হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, শবে ক্বদরকে রমাজানের শেষের দশ দিনের বেজুড় রাত্রসমূহে খোঁজ কর।" (বুখারী)

আরেকটি হাদীসে আখেরী সাত রাত্রসমূহে খোঁজ করার কথা আছে।

শবে ক্বদরের কিছু বাহ্যিক আলামত :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

ليلة القدر سمحة، طلقة لاحارة ولا بردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء

"ক্বদরের রাত শান্ত, সংযত, নাতিশীতোষ্ণ, এই রাতের প্রভাতে সূর্যের আলো আলতো ও হালকা এবং লালাভ হয়ে থাকে।" (সহীহে জামিউসসাগীর হাদীস নং ৫৪৭৫)

আরেক হাদীসে আছে– ...উবাই ইবনে কা'আব বলেন, যে রাতে জেগে থেকে (ইবাদত করার জন্য) আমাকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ দিয়েছেন তা হলো ২৭ তারিখের রাত। এর (বাহ্যিক) আলামত হলো এই রাতের সকালে যখন সূর্য উদিত হয় তখন তা শুভ্র হয়ে থাকে এবং তার কোনো আলোকরশ্মী থাকে না। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৭৬২)

মোট কথা হলো কোন রাতটি শবে ক্বদর তা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নি। বরং হাদীস শরীফে শবে ক্বদরকে রমাজানের ২৭ তারিখ, ২৩ ও ২৯ তারিখ এবং ২১, ২৫ তারিখ রাতেও খোঁজ করার কথা আছে। (বুখারী ও মুসলি রহ. কর্তৃক হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে)

অতএব যে কোনো একটি রাতকে শবে ক্বদর হিসেবে নিজেই নির্ধারণ করে ইবাদত করা এবং অন্য বেজুড় রাতসমূহে গাফেল থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং শবে ক্বদরের ফজীলত অর্জন করতে হলে রমাজানের শেষ দশ দিন নিজেকে ইবাদতে নিয়োজিত রাখা আবশ্যক। এর জন্য উত্তম পন্থা হলো শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা।

শবে কদরের আমল :

শবে ক্বদরের জন্য নির্দিষ্ট কোনো আমল নেই। বরং রমাজানে সাধারণত যে সকল আমল করা হয় সেগুলোতো করবে। এছাড়াও আরো বহু আমল এই রাতে করা যায়। যেমন, বেশি বেশি ইস্তিগফার, বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, সালাতুত তাসবীহ, তাহাজ্জুদ এবং বেশি বেশি দু'আয় রত থাকা।

হাদীস শরীফে আছে– "হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি যদি শবে ক্বদর প্রাপ্ত হই তবে কোন দু'আ পাঠ করব? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তুমি পড়ো–

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

ই'তিকাফ :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষকে বিভিন্ন পন্থা দান করেছেন। নামায, রোযা, হজ্ব। এগুলোর এক একটির পন্থা ও রূপ সম্পূর্ণই ভিন্ন ভিন্ন। তেমনি ই'তিকাফও একটি ভিন্নরূপের অসাধারণ ইবাদত। মানুষ নিজের পার্থিব সর্বপ্রকারের ব্যস্ততা ও কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দরবার তথা মসজিদে চলে যায়, আল্লাহ ছাড়া সমস্ত পার্থিব বস্তু ও কাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ৯-১০ দিনের এই সংক্ষিপ্ত সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর যিকির, দুআ ও ইবাদতে নিয়োজিত থেকে আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং নৈকট্য লাভ করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ই'তিকাফে থাকে, তাঁর পানাহার, ওঠা-বসা, ঘুম-জাগরণ বরং প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়। মনে হবে ই'তিকাফকারী লোক দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু ও কাজ ছেড়ে আল্লাহর ঘরে এসে বলছেন, আমি এসে পড়েছি, আমায় ক্ষমা করে দিন, যতক্ষণ আপনি আমাকে ক্ষমা করছেন না, আমি আপনার দরবার ছাড়ছি না।

ই'তিকাফের অর্থ :

اعتكاف শব্দটি عكف থেকে উৎকলিত। অর্থ বিরত থাকা, পরিহার করা। যেহেতু ই'তিকাফকারী এক দিকে রোযাদার অন্য দিকে নিজের যাবতীয় পার্থিব কাজকর্ম, যাবতীয় স্বার্থ ও উদ্দেশ্য স্বেচ্ছায় পরিহার করে একমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে চলে আসেন, সে কারণে এই কাজের নাম রাখা হয়েছে اعتكاف। ই'তিকাফ।

পরিভাষায় : বিশেষ নিয়্যাতে, বিশেষ অবস্থায়, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে।

শেষ দশ দিন ই'তিকাফ সুন্নাত হওয়ার হিকমাত :

শবে ক্বদরকে পাওয়া এবং এই পবিত্র রাতের ঘোষিত ফজীলত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ই'তিকাফ থেকে উত্তম আর কোনো পন্থা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা শবে ক্বদরের রাতকে নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং এর তারিখ গোপন রেখেছেন। যাতে মুসলমানগণ রমাজানের শেষ দশ দিনের সকল বেজোড় রাতগুলোতে রাত জেগে আমল করতে থাকে।

স্বাভাবিকভাবে মানুষের পক্ষে রাত্রের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে নিয়োজিত থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু মানুষ ই'তিকাফ অবস্থায় যদি রাতে ঘুমিয়েও থাকেন তথাপি তাকে ইবাদতকারীদের মধ্যে শামিল করা হবে। তখন শবে ক্বদরের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে ব্যয় করার ফজীলত অর্জন করবেন তিনি। এটি এত মহান ফজীলত, যার তুলনায় দশ দিনের এই মেহনত ও শ্রম কিছুই না।

নবী (সা.)-এর ই'তিকাফ :

"হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। এমনিভাবে তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন। (অর্থাৎ ইন্তিকাল পর্যন্ত ই'তিকাফের এই মামূল জারি ছিল) (বুখারী ও মুসলিম)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমাজানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। হযরত নাফে' বলেন, আমাকে হযরত ইবনে উমর (রা.) ওই স্থানটি দেখিয়েছেন যে স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফ করতেন। (মুসলিম শরীফ)

ই'তিকাফের ফজীলত :

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইতিকাফকারী গোনাহ থেকে মুক্ত থাকে। তাঁর সমস্ত নেক আমল এমনভাবে লিপিবদ্ধ করতে থাকে যেভাবে তিনি নিজে করতেন। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

অর্থাৎ তিনি ই'তিকাফের বাইরে থাকতে যে সকল ভালো কাজগুলো আঞ্জাম দিতেন, যা তিনি ই'তিকাফ থাকার কারণে পারছেন না, সে আমলগুলো আগের মতোই লিপিবদ্ধ হতে থাকে।

ই'তিকাফ কারা করবে?

ই'তিকাফের জন্য জরুরি হলো, মুসলমান হওয়া, আকেল হওয়া। সুতরাং কফের এবং মাতাল লোকের ই'তিকাফ জায়েয নেই। নাবালক বাচ্চা যেরূপ নামায, রোযা পালন করতে পারে তেমনি ই'তিকাফও করতে পারে। (বাদায়েউস সানায়ে ২/১০৮)

নারীরাও ঘরে কোনো স্থান নির্দিষ্ট করে ই'তিকাফ করতে পারে। তবে তার জন্য স্বামীর অনুমতি আবশ্যক। সাথে সাথে তাকে হায়জ ও নেফাস থেকে পাক থাকতে হবে।

ওয়াজিব ই'তিকাফ এবং সুন্নাত ই'তিকাফে এও শর্ত যে, রোযাদার হতে হবে। যার রোযা হবে না তার ই'তিকাফও হবে না। তবে নফল ই'তিকাফে রোযা আবশ্যক নয়।

ই'তিকাফের স্থান :

পুরুষরা শুধু মসজিদেই ই'তিকাফ করতে পারে। ই'তিকাফের সর্বোত্তম

স্থান হলো মসজিদে হারাম, দ্বিতীয় নম্বরে মসজিদে নববী, তৃতীয় নম্বরে মসজিদে আকসা, চতুর্থ নম্বরে যে কোনো জামে মসজিদ। জামে মসজিদে ই'তিকাফ উত্তম। কারণ জুমআর জন্য অন্যত্র যেতে হবে না। কিন্তু জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা জরুরি নয়। বরং যে সকল শরয়ী মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয় সে মসজিদে ই'তিকাফ করতে পারে। (শামী ২/১২৯)

ই'তিকাফের প্রকার :

ই'তিকাফ তিন প্রকার।

১. সুন্নাত ইতিকাফ : রমাজানুল মুবারকের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফই সুন্নাত। একুশ তারিখের রাত থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এই ই'তিকাফের সময়। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক বছর এই দিনগুলোতেই ই'তিকাফ করতেন। এ কারণে এটাকে সুন্নাত ই'তিকাফ বলা হয়।

২. ওয়াজিব ইতিকাফ : মান্নত করা ই'তিকাফ ওয়াজিব। সুন্নাত ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে গেলে তা কাজা করা ওয়াজিব।

৩. নফল ইতিকাফ : এরূপ ই'তিকাফ মানুষ যে কোনো সময় করতে পারে। অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করা। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যখন যতক্ষণ চায় করতে পারে। রোযারও প্রয়োজন নেই।

এই তিন প্রকারের ই'তিকাফের ভিন্ন ভিন্ন বিধান আছে। এখানে শুধু সুন্নাত ই'তিকাফের কিছু বিধান আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সুন্নাত ই'তিকাফ :

সুন্নাত ই'তিকাফকারীদেরকে বিশ রমাজানের মাগরিবের এটুকু পূর্বে মসজিদের সীমানায় প্রবেশ করতে হবে যাতে সূর্যাস্ত মসজিদেই হয়।

শেষ দশ দিনের ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া। অর্থাৎ মহল্লার যে কোনো একজন ই'তিকাফ করলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে ই'তিকাফ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মহল্লার একজন ব্যক্তিও যদি ই'তিকাফ না করে তবে মহল্লার সকলের সুন্নাত পরিত্যাগের গোনাহ হবে। (শামী)

ই'তিকাফের সবচেয়ে বড় রুকন হলো ই'তিকাফের পুরো সময় মসজিদের সীমানাতেই অবস্থান করা। শরয়ী হাজত তথা শরীয়ত স্বীকৃত বাধ্যতা ছাড়া মসজিদের সীমানা থেকে বাইরে না যাওয়া। শরয়ী জরুরত ছাড়া মসজিদের সীমানার বাইরে সামান্য সময়ও অবস্থান করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

মসজিদের সীমানা :

অনেক লোক মসজিদের সীমানা সম্পর্কে অবগত নন। এ কারণে অনেকে ই'তিকাফ নষ্ট করে থাকেন। অতএব মসজিদের সীমানা সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব প্রয়োজন।

সাধারণত মসজিদের পুরো বাউন্ডারিকেই মসজিদ বলে। অথচ মসজিদের পুরো বাউন্ডারি মসজিদের শরয়ী সীমানা হওয়া আবশ্যক নয়। বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের সীমানা ওই টুকুই যে টুকু স্থান মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ বলে ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

জমিনের কোনো অংশ মসজিদ হওয়া এক জিনিস আবার মসজিদের বিভিন্ন জরুরতে ওয়াকফ করা আরেক জিনিস। শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদ শুধু ওই স্থানকে বলা হয় যে স্থানকে শুধু নামায আদায়ের জন্য মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু প্রত্যেক মসজিদেই এমন কিছু জায়গা থাকে যে জায়গা মসজিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তায় ওয়াকফ করা হয়। যেমন ওযুর স্থান, ইস্তিঞ্জার স্থান, হাম্মাম, গোসলখানা, ইমাম সাহেবের হুজরা ইত্যাদি। এগুলো মসজিদের হুকুমের বাইরে। ই'তিকাফকারী শরীয়ত স্বীকৃত প্রয়োজন ব্যাতিরেকে এসব স্থানে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

কিছু কিছু মসজিদে তো এসব স্থান মসজিদ থেকে পৃথক থাকে। তাই এই স্থানগুলো যে মসজিদের বাইরের অংশ তা সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু বেশির ভাগ মসজিদে এসব প্রয়োজনীয় অংশ মসজিদের সাথে লাগানো ও সম্পৃক্ত থাকে। তাই প্রত্যেকে জ্ঞাত হয় না যে, এসব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেক সময় মসজিদের সিঁড়ি যা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা হয় তা মসজিদের সীমানার অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সেরূপ স্থানেও ই'তিকাফকারী বিনা কারণে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যায়।

সে কারণে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বা ইমামের কাছে মূল মসজিদের সীমানা কতটুকু তা জেনে নেওয়া ই'তিকাফকারীদের জন্য আবশ্যক।

শরীয়ত স্বীকৃত জরুরত কী?

"শরয়ী জরুরত"-এর অর্থ হলো, যে সকল প্রয়োজন পূরণে ই'তিকাফকারীকে মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে। যেমন : প্রশ্রাব, পায়খানার প্রয়োজনীয়তা। ফরজ গোসল, যদি মসজিদে অবস্থানপূর্বক গোসল করা সম্ভব না হয়। ওজু, যদি মসজিদে অবস্থান করে ওজু করা সম্ভব না হয়। খাওয়া পরার বস্তু বাহির থেকে আনা যদি এনে দেয়ার মতো লোক না থাকে। মুআযযিনের আযান দেওয়ার জন্য বাইরে যাওয়া। যে মসজিদে ই'তিকাফ করা হচ্ছে সে মসজিদে যদি জুম'আর ব্যবস্থা না থাকে তবে অন্য মসজিদে যাওয়া। মসজিদ ভেঙে যাওয়া ইত্যাদির কারণে অন্য মসজিদে স্থানান্তরিত হওয়া। এসকল প্রয়োজনীয়তা ব্যাতিরেকে ই'তিকাফাকারীদের জন্য বাইরে যাওয়া নাজায়েয।

যেসব কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয় :

যে সকল প্রয়োজনীয়তার কথা উপরে উল্লেখ করা হলো এসব ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ই'তিকাফকারী মসজিদের সীমানা থেকে বের হলে তা এক মুহূর্তের জন্য হলেও ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (হেদায়া) সেটা ইচ্ছায় হোক বা ভুলক্রমে। তবে ভুলক্রমে হলে ই'তিকাফ নষ্ট করার গোনাহ হবে না। (শামী)

রোযা ই'তিকাফের জন্য শর্ত। যদি কেউ ই'তিকাফ অবস্থায় রোযা ভেঙে দেয়, হোক তা কোনো ওযর বা অপারগতার কারণে, ইচ্ছায় বা ভুলক্রমে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (শামী ও দুররুল মুখতার ২/১৩৬)

কোনো ই'তিকাফকারী কোনো জরুরতের কারণে বাইরে গেছেন, কিন্তু জরুরত সারার পর বাইরেই কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন, তাতেও ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (শামী)

স্ত্রীসহবাসের কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়। রাতে হোক বা দিনে হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুল ক্রমে, বীর্যপাত হোক বা না হোক, মসজিদে হোক কিংবা বাইরে হোক প্রত্যেক অবস্থাতেই ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। (হেদায়া)

ই'তিকাফ অবস্থায় চুম্বন বা চুষণ করা নাজায়েয। যদি এসব কারণে বীর্যপাত হয় তবে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু বীর্যপাত না হলে যদিও তা নাজায়েয তথাপি ই'তিকাফ নষ্ট হবে না।

ই'তিকাফকারী যদি বেহুঁশ বা পাগল হয়ে যায়, জিন-ভূতের আছরের কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থা যদি এক দিন এক রাত বিদ্যমান থাকে তবে ধারাবাহিকতা খতম হয়ে যাওয়ার কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। যদি এক দিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হুঁশ বা বুদ্ধি ফিরে আসে তবে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। (আলমগীরী)

যেসব কারণে ই'তিকাফ ভেঙে দেওয়া জায়েয :

ই'তিকাফকারী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, যার চিকিৎসা মসজিদের বাইরে যাওয়া ছাড়া সম্ভব না হয় তবে তার জন্য ই'তিকাফ ভেঙে দেওয়ার অনুমতি আছে। (শামী)

বাইরে কোনো লোক ডুবে যাচ্ছে বা আগুনে দগ্ধ হচ্ছে তাকে বাঁচানোর আর কেউ নেই, সে রূপ কোথাও আগুন লেগেছে, নিভানোর কেউ নেই তবে অন্যের প্রাণ বাঁচানোর এবং আগুন নিভানোর জন্য ই'তিকাফকারীর ই'তিকাফ ভেঙে দেওয়ার অনুমতি আছে।

জোরপূর্বক মসজিদে থেকে ই'তিকাফকারীকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় যেমন ওয়ারেন্ট এসে গেলে ই'তিকাফ ভেঙে দেওয়া জায়েয। সেরূপ ই'তিকাফকারীর যদি এমন সাক্ষ্য দেওয়া জরুরি যা শরীয়তানুযায়ী তার জন্য ওয়াজিব সেরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ই'তিকাফ ভেঙে যাওয়ার অনুমতি আছে।

মাতা-পিতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির অসুস্থতার কারণেও ইতিকাফ ভেঙে দেওয়া জায়েয। সেরূপ পরিবারের কারো প্রাণ, সম্পদ বা ইজ্জত আশঙ্কার সম্মুখীন হয় এবং এর ই'তিকাফ অবস্থায় তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে ই'তিকাফ ভেঙে দেওয়া জায়েয।

যদি কোনো জানাযা হাজির হয় এবং জানাযা পড়ানোর কেউ না থাকে তখনো ই'তিকাফ ভেঙে দেওয়া জায়েয। (ফতহুল কদীর ২/১১১)

উল্লিখিত জরুরতগুলো পূরণ করতে বের হলেই ই'তিকাফ ভেঙে যাবে, তবে গোনাহ হবে না। (বাহরুর রায়েক ২/৩২৬)

ই'তিকাফ ভেঙ্গে গেলে করণীয় :

সুন্নাত ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের বাইরে চলে আসা জরুরি নয়। বরং বাকি দিনগুলো নফলের নিয়্যাত করে ই'তিকাফ করা যেতে পারে। এর দ্বারা সুন্নাতে মুআক্কদা তো আদায় হবে না কিন্তু নফল ই'তিকাফের ছওয়াব পাওয়া যাবে। যদি অনিচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে ই'তিকাফ নষ্ট হয় তবে হতে পারে আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে সুন্নাত ই'তিকাফেরও ছওয়াব দিয়ে দিতে পারেন। সে কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে গেলে উত্তম হলো বাকি দিনগুলোও পূর্ণ করা। ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে চলেও আসতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। আবার এক দিন পরে গিয়ে নফল ই'তিকাফের নিয়্যাত করে মসজিদে আবার ই'তিকাফ আরম্ভও করতে পারে, তা জায়েয আছে।

ই'তিকাফের কাজা :

যে দিন ই'তিকাফ নষ্ট হয়েছে শুধু সে দিনেরই কাজা করা ওয়াজিব। পুরো দশ দিনের কাজা করা ওয়াজিব নয়। (শামী)

ক্বাজা দেওয়ার নিয়ম হল, উক্ত রমাজানের যে কোনো এক দিন সূর্যাস্ত থেকে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজা করার নিয়্যাতে ই'তিকাফ করা। যদি রমাজান মাস শেষ হয়ে যায় বা কোনো কারণে ওই সময় ই'তিকাফ করা সম্ভব না হয় তবে রমাজান ছাড়াও যে কোনো দিন রোযা রেখে এক দিনের জন্য ই'তিকাফ করা যায়। যদি পরের রমাজানেও কাজা করা হয় তাও হবে। কিন্তু যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজা করে নেওয়া উত্তম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে ই'তিকাফ করার তাওফীক দান করুন। আমীন

(অবলম্বনে : 'মাহে রমাজান', মাওলানা তাহের আলম, নায়েবে মুহতামিম, জামিআ ফারুকিয়া, পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ৫৩-৭৫)

প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি-২

ইখলাস-নিষ্ঠা, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, উচ্চ সাহসিকতা, আদাব ও শিষ্টাচার

মূল : মাওলানা হুযায়ফা দস্তানভী

অনুবাদ : সলিমুদ্দীন মাহদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর :

২.আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম (রহ.) যিনি ইমাম মালেক (রাহ.)-এর অন্যতম শীর্ষ ছিলেন। তিনি কিভাবে এতবড় ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস হয়েছেন? কাজী আয়াজ (রহ.) ''তারতীবুল মাদারিক'' গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম উতাক্বী (মৃত-১৯১হিজরী) সম্পর্কে লিখেন, (স্মরণ রাখা চাই, তিনি ইমাম মালেক এবং লায়স প্রমুখের কৃতী ছাত্র ছিলেন) ইবনে কাসেম বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.)-এর কাছে রাতের শেষভাগে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় পৌঁছলাম। কখনো দুইটি, কখনো তিনটি আবার কখনো চারটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতাম। তখন মুহতারাম ইমাম

সাহেবের স্বভাব খুবই শান্ত অনুভূত হতো। একদা তাঁর চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছি। ইমাম মালেক (রহ.) নামাযের জন্য মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিন্তু অধিক ঘুমের কারণে আমার কোনো খবর ছিল না। চোখ তখনই খুলল যখন এক কৃষ্ণ দাসী আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, তোমার 'মুনিব-মালিক' চলে গেছেন, তিনি তোমার মতো গাফেল থাকেন না। আজ ৪৯ বছর ধরে তিনি সদা এশার ওজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেন। এই কৃষ্ণ দাসী তাঁকে প্রায়শ ইমাম সাহেবের কাছে আনাগোনা করতে দেখে তাঁর দাস মনে করত।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর সুহবত-সংশ্রবে ১৭ বছর :

ইবনে কাসেম বলেন, আমি ইমাম মালেক (রহ.)-এর সংশ্রবে ধারাবাহিকভাবে ১৭ বছর ছিলাম। কিন্তু এই সময়ে আমি কোনো প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় করিনি। (বাজারের অলি-গলিতে ঘোরাফেরাকারী ছাত্রভাইরা একটু ভেবে দেখতে পারেন, তিনি সতের বছর পর্যন্ত কোনো ক্রয়-বিক্রয় করেননি)।

পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ :

তিনি বলেন, একদিন আমি তাঁর সুহবতে বসা ছিলাম। হঠাৎ পবিত্র হজব্রত পালনকারী মুখোশপরিহিত এক মিসরী যুবকের আগমন হলো, তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-কে সালাম করে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের এখানে ইবনে কাসেম কে? লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করেন। ওই ব্যক্তি আমার পার্শ্বে এসে আমার কপালে চুমু খেলেন। আমি তাতে এক অদ্ভুত সুগন্ধির অনুভব করলাম, কথা দ্বারা তার বিবরণ দেয়া যাবে না। বস্তুত সে ছিল আমার ছেলে। এই সুগন্ধি তার কাছ থেকে বের হচ্ছে। আমি যখন ঘর থেকে বের হলাম তখন সে মায়ের পেটে ছিল। আমি তার মাকে (যিনি আমার স্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে আমার চাচাতো বোনও) বলে এসেছিলাম, আমি দীর্ঘদিনের জন্য যাচ্ছি। কখন ফিরব তা জানা নেই। তাই, তোমার জন্য অনুমতি আছে। যদি চাও আমার বিবাহে আবদ্ধ থাকবে, না হয় স্বাধীন হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারবে। কিন্তু ওই আল্লাহর বাঁদী স্বাধীন হওয়ার পরিবর্তে আমার বিবাহে আবদ্ধ থাকলেন। (সবর ওয়া ইস্তিকামত কে পায়কর : ৫১-৫২)

৩. মুহাম্মদ ইবনে তাহের মুকাদ্দেসী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হাদীসের ইলম অর্জন করার জন্য প্রচণ্ড গরম ও তীব্র রোদের মধ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার কারণে বহুবার রক্ত প্রস্রাব করেছেন। (ওফ্ইয়াতুল আ'য়ান)

৪.আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর ইলম অর্জনের যমানা :

হাফেজ যাহাবী (রহ.) 'তাযকারাতুল হুফ্ফাজ' গ্রন্থে আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর সম্পর্কে লিখেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে হাতেম, আবু নসর সঞ্জরী (মৃত : ৪৪৪ হি.) হাদীস শাস্ত্রে 'হাফেজ'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন। শুধু এটি নয়, বরং তিনি তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড় হাফেজে হাদীস, ইমাম এবং সুন্নাতের আলোকবর্তিকা ছিলেন। এই মহান ব্যক্তি হাদীসের জ্ঞান আহরণ করার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করতেন।

এক মহিলার প্রস্তাব :

আবু ইসহাক হব্বাল (রহ.) বলেন, আমি একদিন আবু নসর সঞ্জরী (রহ.)-এর সুহবতে বসা ছিলাম। কোনো আগন্তুক এসে দরজার কড়া নাড়ল। আমি দরজা খুলে দিলাম। তখন দেখলাম একজন মহিলা ঘরে প্রবেশ করল। সে একশত দিনারের একটি থলে বের করল এবং তা শায়খের সামনে রেখে বলল, এগুলো নিয়ে যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন। শায়খ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার উদ্দেশ্য কী? তখন সে বলল, 'আমি চাই, আপনি আমাকে বিবাহ করুন, যদিও আমার বিবাহ-শাদির কোনো প্রয়োজন নেই তবে এভাবে আপনার খেদমত করতে চাই'। তখন শায়খ বলেন, থলে নিয়ে এখান থেকে উঠে যাও। যখন সে চলে গেল, তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি আপন জন্মভূমি সিজিস্থান থেকে শুধুমাত্র ইলম অর্জন করার নিয়্যাতেই ঘর থেকে বের হয়েছি। এখন যদি আমি

বিবাহ-শাদির ঝামেলায় লিপ্ত হই তাহলে আমি আর তালেবে ইলম কিভাবে রইলাম? আল্লাহ তাআলা ইলম অর্জনের যে ছওয়াব রেখেছেন তার ওপর আমি কখনো কোনো বস্তুকে প্রাধান্য দিতে পারি না। (সবর ওয়া ইস্তিকামত কে পায়কর : ৪৪)

৫. হাফেজ ইবনে মুন্দা (রহ.) স্বদেশ থেকে বিশ বছর বয়সে ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলেন। এবং ধারাবাহিকভাবে ৪৫ বছর পর্যন্ত সফর করে ইলম অর্জন করেছেন। অতঃপর ৬৫ বছর বয়সে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যখন ঘর থেকে বের হলেন, তখন মুখে একটি দাড়িও গজেনি। আর যখন প্রত্যাগমন করেন তখন চুল-দাড়ি সব সাদা হয়ে গেছে। কিন্তু এত সময়ে কত ইলম অর্জন করেছেন? জাফর মুস্তাগফিরী বলেন, আমি হাফেজ আবু আব্দ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুন্দা (রহ.) থেকে এক সময় জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কত ইলম অর্জন করলেন? তখন তিনি বলেন, পাঁচ হাজার মণ পরিমাণ, আল্লাহু আকবার! । (তাযকারাতুল হুফ্ফাজ)।

৬. ইমাম শা'বী ইবনে শুরাহিল কূফী হামদানী (রহ.)-একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ জানতে চাইলেন, আপনি কিভাবে জ্ঞান অর্জন করেছেন? তখন তিনি বলেন, চারটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরার কারণে। ১. কখনো কোনো কিতাব বা খাতার ওপর ভরসা করিনি, বরং যা শুনেছি সব মুখস্থ করে নিয়েছি। ২. ইলম অর্জনের জন্য দেশে দেশে সফর করেছি। ৩. জড় পদার্থের ন্যায় ধৈর্যধারণ করেছি, অর্থাৎ জড় পদার্থকে পানাহার দাও বা না দাও, সদা চুপ থাকে। আমিও তৃষ্ণা-ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করতাম। ৪. কাকের মতো সকাল সকাল উঠে যেতাম, অর্থাৎ খুবই অল্প ঘুমাতাম। তাই আমি এই ইলমের অধিকারী হয়েছি। (তাযকারাতুল হুফ্ফাজ)

৩. উচ্চ সাহসিকতাঃ

প্রিয় তালেবে ইলম বন্ধুরা! এগুলো ছিল আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্তহীন চেষ্টা ও মুজাহাদা। তাই বোঝা যায় ইলম অর্জন করার জন্য ধারাবাহিক মেহনত ও উচ্চ সাহসিকতার প্রয়োজন। আল্লামা যুরনূজী (রহ.) বলেন, যদি খুবই মেহনত হলো কিন্তু উচ্চ সাহস না থাকে তখনো বেশি ইলম অর্জন করা যাবে না। সাহস তো আছে তবে যদি মেহনত না থাকে তখনো ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমানে আমাদের ছাত্রদের কাছে এই মহামারি ছড়িয়ে আছে যে, তাদের কাছে মেহনতের জযবা ও আবেগ নেই। যদি মেহনতের জযবা আসে তবে উচ্চ সাহস নেই, অর্থাৎ কোনো কিতাবকে যখন মেহনতের পর বুঝে না আসে তখন জটিল মনে করে নিরাশ হয়ে পড়ে। এটি অনেক বড় ভুল। যেমন আমরা আমাদের আসলাফদের মেহনত-মোজাহাদার ওপর কয়েকটি বিস্ময়কর কাহিনী উল্লেখ করেছি তেমনি তাদের উচ্চ সাহসিকতার দু-একটি উদাহরণ নমুনা স্বরূপ পেশ করছি।

ইমাম ইবনুল কায়্যুম রহ. বলেন, আমি ছাত্রদের ওপর আর্শ্চযান্বিত, তারা তো নিজেরাই অবলোকন করছে যে, প্রত্যেক মূল্যবান বস্তু অর্জন করার জন্য উচ্চ সাহসিকতা ও চেষ্টা-কোশিশের প্রয়োজন। কিন্তু ইলম সম্পর্কে তারা মনে করে তা এমনে এমনি অর্জিত হয়ে যাবে। এটি কী করে সম্ভব? যেহেতু ইলম হলো পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে বেশি মূল্যবান। একটু ভেবে দেখুন, তার জন্য কত সাহস ও মেহনতের প্রয়োজন! ধারাবাহিক মেহনত ও লাগাতার তাকরার এবং আরাম ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করলেই ইলম অর্জিত হয়।

একজন ফক্বীহ বলেন, আমি এক যুগ ধরে 'হারিসা' (আরবের এক প্রকার সুস্বাদু খাবার) খাওয়ার ইচছা করেছিলাম, কিন্তু কখনো খেতে পারিনি। কেননা, তখন 'হারিসা' বাজারে বিক্রি হতো। বাজারে গেলে দরস ছুটে যাবে, তাই যায়নি। কারণ কখনো আমি দরস পরিত্যাগ করাকে পছন্দ করতাম না।

ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, শরীরের আরামের সাথে ইলম অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়।

ইমাম মযানী (রহ.) বলেন, কেউ ইমাম শাফী (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ইলম অর্জন করে কেমন তৃপ্তি পান? তিনি বলেন, যখন আমি কোনো নতুন জ্ঞানের দিক উন্মোচন করি, বা নতুন কোন ইলমী কথা শ্রবণ করি তখন আমি এত আনন্দিত হই এবং স্বাদ পাই, মনে চায় আমার শরীরের সকল অঙ্গের যদি শ্রবণশক্তি থাকত তাহলে প্রত্যেক অঙ্গই এই স্বাদ গ্রহণ করত।

অতঃপর কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ইলমের প্রতি কী পরিমাণ লোভ করেন? আপনি কি এত পরিমাণ লোভ করেন যে পরিমাণ কোনো সম্পদ লোভী মানুষ সম্পদের প্রতি লোভী হয়ে থাকে? অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, আপনার ইলম অর্জন করার পদ্ধতি কী? তখন তিনি বলেন, ওই সন্তানহারা মায়ের মত যিনি তার সন্তানের তালাশে কোনো অনিষ্টের পরোয়া করে না।

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, আমি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে ইব্রাহীম হারাবীর পার্শ্বে পঁচিশ বছর অবস্থান করেছি।

ইলমে নাহুর ইমাম, খলীল ফরাহেদী (রহ.) বলেন, ওই সময়টি আমার জন্য খুবই কষ্টকর যে সময়টি আমি পানাহারে ব্যয় করি। কেননা, তাতে কোনো ইলম অর্জন করা যায় না।

আম্মার ইবনে রজা (রহ.) বলেন, ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি নিজের হাতে খানা খেতে পারিনি। আমি হাদীস লিখতাম আর আমার বোন আমাকে লোকমা বানিয়ে খাইয়ে দিতেন।

বাকী ইবনে মাখলাদের বিস্ময়কর কাহিনী :

এটি এমন এক ইলম পাগলের ঘটনা যিনি সুদূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহস্র মাইল পায়ে হেঁটে সফর করেছেন। কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে মুসলমানদের একজন প্রসিদ্ধ বড় আলেম আছেন, তার সুহবত-সান্নিধ্য অর্জন করা এবং তাঁর কাছ থেকে ইলমে হাদীস অর্জন করা। যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন তখন শুনতে পেলেন, সরকার কর্তৃক তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে, তিনি কাউকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতে পারবেন না। এবং তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎও কেউ করতে পারবে না। কিন্তু এই লোক ইলমের পাগল ও প্রকৃত ইলম অর্জনকারী ছিলেন, তিনি ইলম অর্জনের এমন পন্থা অবলম্বন করেন যে, তার কল্পনা করাও সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য।

বাকী ইবনে মাখলাদের হেঁটে বাগদাদ সফর :

জ্ঞানের অঙ্গনের ঐতিহাসিক রচনা "মানহাজে আহমদ ফি তারাজীমি আসহাবে ইমাম আহমদ" গ্রন্থে ইমাম বাকী ইবনে মাখলাদ আন্দলুসী (রহ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন, ''হাফেজে হাদীস আবু আব্দুর রহমান বাকী ইবনে মাখলাদ আন্দলুসী (রহ.) ২০১ হিজরীতে জন্মলাভ করেন, তিনি আন্দলুস থেকে বাগদাদ পর্যন্ত হেঁটে সফর করেছেন। উদ্দেশ্য ছিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের খেদমতে হাজির হয়ে ইলমে হাদীস অর্জন করা।

ভয়ানক সংবাদ :

স্বয়ং তিনি বলেন, যখন আমি বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছলাম তখন ওই পরীক্ষা ও বিপদের সংবাদ পেলাম যা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ওপর চেপে বসে ছিল। এবং জানতে পারলাম তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করা বা তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই সংবাদ পেয়ে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হলাম। আমি সেখানেই থেমে গেলাম। আসবাবপত্র মুসাফিরখানার একটি কামরায় রেখে বাগদাদের একটি আজীমুশ্‌শান মসজিদে পৌঁছলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সম্পর্কে কী বলে তা খতিয়ে দেখা। এবং তাঁর সম্পর্কে কী কী অভিযোগ করছে? তা জেনে নেয়া।

এক অপূর্ব দরস :

হঠাৎ সেখানে অত্যন্ত সুন্দর ও সুসজ্জিত দরস দেখলাম। এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী আলোচনা করছেন। তিনি কাউকে দুর্বল ও কাউকে শক্তিশালী বলছেন। আমি আমার পার্শ্বের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে? ওই ব্যক্তি বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈন! আমি তাঁর নিকটে একটি খালি জায়গা দেখে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং জিজ্ঞাসা করলাম, শায়খ আবু যাকারিয়া! আমি একজন বিদেশি লোক। আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আমি আপনার কাছ থেকে কিছু বিষয় জেনে নিতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি বলেন, কী বলতে চান? বলেন।

কয়েকটি প্রশ্ন :

আমি এমন অনেক মুহাদ্দিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি কাউকে ঠিক এবং কাউকে বেঠিক বলেছেন। পরিশেষে হিশাম ইবনে আম্মার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর সাথে আমি কয়েক দফা সাক্ষাৎ করেছি। তাঁর কাছ থেকে হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার রপ্ত করেছি। তিনি তাঁর নাম শুনে বলেন, আবুল ওয়ালিদ হিশাম ইবনে আম্মার, দামেশকের অধিবাসী। অনেক বড় নামাযী এবং ''সিকা' নির্ভরযোগ্য বরং তার চেয়েও উর্ধ্বে। আমি এতটুকু বলার পর পরই দরসের অন্যরা চিৎকার দিয়ে উঠল, জনাব সংক্ষিপ্ত করুন। অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিন। আমি দাঁড়িয়ে আরজ করলাম, হযরত! আমি আহমদ ইবনে হাম্বল সম্পর্কে জানতে চাই। এ কথা শুনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুঈন আমার দিকে খুবই আর্শ্চযান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, আমার মতো লোকের পক্ষে আহমদ ইবনে হাম্বলের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি তো মুসলমানদের ইমাম, তাদের স্বীকৃত আলেম, জ্ঞান ও গুণের অধিকারী এবং সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ঘরে :

তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম, এবং জিজ্ঞাসা করতে করতে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ঘরে পৌঁছলাম। তাঁর দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি তাশরীফ আনলেন, এবং দরজা খুললেন, তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট করলেন। স্পষ্ট কথা আমি তাঁর নিকট একজন অপরিচিত লোক। তাই আমি তাঁকে বললাম, হযরত! আমি একজন বিদেশি লোক, এই শহরে প্রথম দফা এসেছি। হাদীসের অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য। এবং কেবলমাত্র আপনারই খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্যই এই সফর। তিনি বলেন, ভেতরে এসো, যেন তোমাকে কেউ দেখতে না পায়।

প্রশ্নোত্তর :

আমি ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, সুদূর প্রাচ্যে। তিনি বলেন, আফ্রিকা? আমি বললাম, আরো অনেক দূরে। আফ্রিকা যেতে আমাদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। আমি আন্দলুসের বাসিন্দা। তিনি বলেন, বাস্তবেই কি তোমার দেশ অনেক দূরে? ঠিক আছে, তোমার উদ্দেশ্য পূরণ করতে যতটুকু সাধ্য-সহযোগিতা করাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু কী করব? এখন তো বিপদে আছি। হয়ত তুমি জেনেছ। তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি এ ব্যাপারে শহরের নিকটে এসেই জানতে পারি। *(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

উদীয়মান কাফেলা

"জানাযার নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ ও মুনাজাত" একটি পর্যালোচনা

পূর্ব প্রকাশিতের পর

খ. যদি উক্ত হাদীসকে মেনে নেওয়াও হয়, তাহলে তার ব্যাখ্যা এমন বলা হবে যে, আলোচ্য হাদীসে فصلى عليه এর দ্বারা জানাযার নামায উদ্দেশ্য নয়। কেননা হাদীসের ভাষ্য হচ্ছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানের খবরাখবর সকলকে শোনাচ্ছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় একের পর এক হযরত যায়েদ (রা.) ও হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেন। আর মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থাতেই তাদের জন্য দু'আ করেন এবং উপস্থিত সকলকে দু'আ করতে বলেন। এই হাদীসে صلى عليه বাক্যটি دعاله এর অর্থে। এবং পরবর্তী বাক্য عطف টি واو এর মাধ্যমে دعاله تفسيرى হিসেবে গণ্য। যা আরবী ভাষায় অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই তো শায়খ আব্দুল হক্ব দেহলভী (রহ.) মাদারিযুন নবুওয়্যাত" গ্রন্থে ২৬৪নং পৃষ্ঠায় লেখেন–

حضرت بروے دعائے خیر کرد، یاراں رافرمود کہ برائے وے طلب آمیز کنید۔

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)হযরত যায়েদ (রা.) এবং জাফর (রা.)-এর জন্য নেক দু'আ করলেন। এবং সাহাবীগণকে বললেন, যেন তারাও তাঁদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেন।

৩ নম্বর দলিলের উত্তর :

জানাযার নামায একবার পড়ে ফেলার পর দ্বিতীয়বার পড়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে হানাফীগণ ও শাফেয়ীগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীগণ নিষেধের মত পোষণ কারী। "মবসূত" গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে এর সপক্ষে দলিল হিসেবে আনা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর জানাযার নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর আগমন করলে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যদিও তোমরা জানাযার নামাযে আমাকে পিছে ফেলেছ (অর্থাৎ আমি আসার আগেই জানাযা পড়ে ফেলেছ) তাই বলে দু'আতে আমাকে পিছে ফেলতে পারবে না। আমি একাকী দু'আ করব। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার কথা বোঝা যাচ্ছে। তাই যে ব্যক্তির জানাযার নামায ছুটে যাবে সে আর জানাযার নামায পড়বে না। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য একাকী মাগফেরাতের দু'আ করবে।

বিধায় যারা জানাযার নামায পড়েছে, তারাই আবার জানাযার পরে দাফনের পূর্বে সম্মিলিত দু'আ করবে।" উক্ত হাদীস দ্বারা এমন কথা প্রমাণের চেষ্টা অবান্তর।

৪ নম্বর দলিলের উত্তর :

ইবনে মাজাহ শরীফের ১০৮ নং পৃষ্ঠায় باب ماجاء فى التكبير على الجنازة اربعا "জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর শিরোনামের অধীনে উক্ত হাদীসটি এভাবে আছে–

عن الهجرى قال صليت مع عبد الله بن ابى اوفى الاسلمى صاحب رسول الله ﷺ على جنازة ابنة له فكبر عليها اربعا فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحى الصفوف فسلم ثم قال اكنتم ترون انى مكبر خمسا قالوا يخوفنا ذلك قال: لم اكن لافعل ولكن رسول الله ﷺ كان يكبر اربعا ثم يمكث ساعة فيقول ماشاء الله ان يقوم ثم يسلم۔

হযরত ইবরাহীম হিজরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রা.)-এর সাথে তার মেয়ের জানাযার নামায পড়েছি। তিনি সেই জানাযায় চারটি তাকবীর দিয়েছিলেন। এবং চতুর্থ তাকবীরের পর কিছুক্ষণ থেমেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (রা.) বলেন, সে সময় আমি জানাযায় অংশগ্রহণ কারীদের থেকে তাসবীহর আওয়াজ শুনেছি। যা হোক তিনি সালাম ফিরালেন। এরপর বললেন, তোমরা কি ধারণা করেছ, আমি পঞ্চম তাকবীর বলব? সকলে বলল হ্যাঁ তাই ভেবেছিলাম। তিনি বললেন, না এমনটি নয়। তবে (আমি দেখেছি) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন চার তাকবীর বলে ফেলতেন তখন সামান্য সময় অপেক্ষা করতেন। এবং কিছু দু'আ করতেন। এরপর সালাম ফিরাতেন।

উক্ত হাদীসটি বায়হাকী শরীফের ৪র্থ খণ্ড ৪২ নং পৃষ্ঠায় باب ماروى فى الاستغفار والدعاء بين التكبيرة الرابعة والسلام "চতুর্থ তাকবীর ও সালামের মাঝে দু'আ" শিরোনামের অধীনে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এই অধ্যায় ওই সমস্ত দু'আ ও ইস্তিগফারের ব্যাপারে যা চতুর্থ তাকবীর এবং সালামের মাঝে করা হয়। মোটকথা উক্ত হাদীসটি সালামের পূর্বের দু'আ সম্পর্কিত। সালাম পরবর্তী দু'আর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তো আইম্মায়ে কেরামগণও এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত রেওয়ায়াত জানাযার পরের দু'আ সম্পর্কিত নয়। যা ইবনে মাজাহ শরীফের আলোচ্য হাদীসের শেষাংশ ثم يسلم দ্বারা সুস্পষ্ট। বায়হাকী শরীফের ৪র্থ খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠায় باب من قال يسلم عن يمينه وعن شماله "ডানে বামে সালাম ফিরানো

শিরোনামের অধীনে বর্ণিত উক্ত হাদীসেরই শেষাংশ দ্বারা প্রমাণিত। তার শেষাংশ হলো ثم سلم عن يمينه وعن شماله "অতঃপর ইবনে আবি আউফা (রা.) তাঁর ডানে বামে সালাম ফিরালেন।

সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ প্রমাণের চেষ্টা করা অযৌক্তিক।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি কোনো ব্যক্তি জানাযার নামাযে শরীক হতে না পারে। তাহলে করণীয় কী? সে কি দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারবে না?

উত্তরে বলা হবে, না। সে আর জানাযার নামায পড়বে না। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য শুধু মাগফেরাতের দু'আ করবে। হ্যাঁ যদি মৃত ব্যক্তির জানাযা এমন লোকেরা পড়ে ফেলে যারা তার ওলী বা অভিভাবক নয় অথবা অভিভাবক কর্তৃক অনুমতি প্রাপ্তও নয়। তাহলে পরবর্তীতে তার ওলি উপস্থিত হলে জানাযার নামায আবার পড়তে পারবে। এবং তার সঙ্গে জানাযার নামায পড়েনি এমন ব্যক্তিরাও শরীক হতে পারবে।

এ সম্পর্কে "ফাতাওয়া আলমগীরি" খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৭৯-এ উল্লেখ আছে যে,

ولا يصلى على ميت الامرة واحدة والتنفل بصلاة الجنازه غير مشروع ولا يعيد الولى ان صلى الامام الاعظم او السلطان او الوالى او القاضى او امام الحى لان هؤلاء اولى منه وان كان غير هؤلاء له ان يعيد۔

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায একবারই পড়বে। দ্বিতীয়বার পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা বাদশাহ কিংবা তাদের প্রতিনিধি অথবা মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেব জানাযার নামায পড়ে ফেলে, তাহলে মৃতের অভিভাবক দ্বিতীয়বার জানাযা পড়বে না। কেননা তাঁরা তার থেকে বেশি অগ্রাধিকার রাখে। হ্যাঁ, যদি তাঁরা ব্যতিত অন্য কেউ পড়ে তাহলে অভিভাবকের জন্য দ্বিতীয়বার পড়ার অনুমতি আছে। এমনিভাবে বাদায়েউস সানায়ে খণ্ড. ১ পৃষ্ঠা ৩৩৭ এ উল্লেখ আছে–

ولا يصلى على ميت الا مرة واحدة لا جماعة ولا وحدانا عندنا الا ان يكون الذين صلوا عليها اجانب بغير امر الاولياء ثم حضر الولى فحينئذ له ان يعيدها۔

"একবার জানাযা পড়ার পর দ্বিতীয়বার আর পড়বে না। না একাকী না সম্মিলিত। তবে যদি কেউ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত পড়ে ফেলে, তাহলে পরবর্তীতে অভিভাবক এসে ইচ্ছা করলে পুনরায় পড়তে পারবে।

পরিশিষ্ট :

জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে যদি এমন ব্যক্তি উপস্থিত হয় যার জন্য পুনরায় জানাযার অনুমতি নেই, সে একাকী মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করবে। এমনিভাবে কেউ জানাযার নামাযান্তে দাফনের পূর্বে মৃতের জন্য একাকী মনে মনে মাগফেরাতের দু'আ করতে চাইলে তার অবকাশও আছে। কিন্তু যারা নামায পড়বে, তারাই আবার সম্মিলিত দু'আ করবে। এর কোন শরয়ী প্রমাণ নেই তাই এই দু'আকে সুন্নাত বলার কোনো সুযোগ নেই। বরং এটিকে কেউ সুন্নাত বললে বা এমন করা জরুরি মনে করলে তা বিদআত বলে পরিগণিত হবে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে সহীহ পদ্ধতি মোতাবেক আমল করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের তৌফীক দান করুন। (আমীন)

(সমাপ্ত)

-আরিফুল হক সিদ্দিক

(৪৩ পৃষ্ঠার পর)

التائب من الذنب كمن لاذنب له

"গোনাহ থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির ন্যায় যার কোনো গোনাহ নেই।" (৫)

আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারী ব্যক্তির ওপর কোন পর্যায়ের খুশি হন সে ব্যাপারে একটি ঘটনা :

জনৈক ব্যক্তি নিজের একটি উট নিয়ে সফরের জন্য বের হলো আর সে ব্যক্তি ক্ষুধার্তাবস্থায় ছিল। তবে তার সাথে কিছু খাবারও ছিল। কিছু দূর যেতে না যেতেই ওই লোক একটি বৃক্ষের নিচে বসে পড়ল এবং উটটিকে জঙ্গলের দিকে ছেড়ে দিল। এমতাবস্থায় সে লোক ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল যে, উটটি এখনো ফিরে আসে নাই। এদিকে ওই লোক অত্যন্ত ক্ষুধার্তাবস্থায় পড়ে রইল। কিন্তু খাবারগুলো রয়ে গেছে উটের সাথে। আহ! এটা কেমন পেরেশানির কথা। যাই হোক সে আবারো ঘুমিয়ে পড়ল এবার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল উটটি তার সামনে। সে তাড়াতাড়ি খাবারগুলো খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করল। তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞেস করলেন হে আমার সাহাবীগণ! তোমরা বল দেখি যদি কোনো উপোস ব্যক্তি নিতান্ত ক্ষুধার্তাবস্থায় খানা খায় এবং একটি উট হারিয়ে যাওয়াতে কঠিন পেরেশানি অবস্থায় হঠাৎ উটটি পেয়ে যায় তাহলে সে কেমন খুশি হবে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক খুশি হবে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে আমার সাহাবারা! খাঁটি তাওবা করার দ্বারা আল্লাহ পাক এর চেয়েও বেশি খুশি হন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে খাঁটি তাওবা করে নিষ্পাপ হয়ে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন-ছুম্মা আমীন।

তথা সূত্র : (১) সূরায়ে রা'আদ আয়াত-২৮ (২) প্রাগুক্ত-২৮ (৩) সূরায়ে হুদ্ আয়াত-১১৪ (৪) সূরায়ে তাহরীম আয়াত-৮(৫) মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা-২০৬

ভাষান্তর : মোহাম্মদ শরফুদ্দীন আল্ আযীযী, খিরামী।

পাপী ব্যক্তি নিষ্পাপ হওয়ার সর্বোত্তম উপায়
"তাওবা"

মুফতী জমীল আহমদ সাহেব (দা. বা.)
স্বনামধন্য উসতায দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত।

(মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা,ঢাকার ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশ্যে ৩/২/২০১১ সালে হযরত মুফতী জমীল আহম সাহেব দা. বা. গুরুত্বপূর্ণ একটি বয়ান রেখেছিলেন। তার অনুবাদ এই নিবন্ধটি)

তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর দরূদশরীফ পাঠ করার পর পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন–

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থ : শুনে রেখো! একমাত্র আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারাই অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। (১) প্রত্যেক মানুষ চায় যে, আমার জীবনটি শান্তিতেই অতিবাহিত হোক। উদাহরণ স্বরূপ, ব্যবসায়ী ব্যবসা করছে-তো আপনি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি ভাই আপনি কেন ব্যবসা করছেন, আপনার উদ্দেশ্য কী? তাহলে তিনি অবশ্যই বলবেন, আমি ব্যবসা করে টাকা-পয়সা আয় করব এবং মা-বাবা, ছেলে-সন্তানদের নিয়ে শান্তিতে জীবন-যাপন করব। তেমনি কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী তিনি মুমিন হোক বা মুর্তিপূজক যে কোনো স্তরের ও ধর্ম মতাদর্শের লোককে আপনি জিজ্ঞাসা করুন সবাই প্রত্যুত্তোরে বলবে, টাকা-পয়সা অর্জন করে পরিবার নিয়ে শান্তিতে জীবন-যাপন করাই উদ্দেশ্য।

পৃথিবীর সব মানুষ দু'টি বিষয়ে একমত–
(১) অন্তরের প্রশান্তি অর্থাৎ শান্তিতেই জীবন-যাপন করা (২) মৃত্যু।

দিলের প্রশান্তি যেটা নিয়ে মানুষ পেরেশান আর পেরেশান। এই প্রশান্তি আমার আর আপানার মধ্যে কিভাবে আসবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে,

الا بذكر الله تطمئن القلوب

অর্থ : শুনে রেখো! একমাত্র আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। (২) এখন আমাদের জানতে হবে যিকির কিভাবে করব।

যিকির করার পদ্ধতি :

(ক) যিক্‌রে লিছানী। অর্থাৎ মৌখিক তথা প্রকাশ্য যিকির যেটা সাধারণ ভাবে আমরা করে থাকি যেমন-আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ,। (খ) যিক্‌রে ক্বালবী। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকির ও ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা (গ) যিক্‌রে জাছাদী। আর্থাৎ একমাত্র আল্লার জন্যই বিনয় করা। বিনয় করাটাই হলো অহংকার-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বিনয় মানুষ কে সম্মানী বানিয়ে দেয় পক্ষান্তরে অহংকার-আত্মগৌরব মানুষকে অপমানিত করে।

একটি ঘটনা :

আমার উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাহমূদ হাছান গাঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছে এক গ্রাম্য লোক এসে বলল হুজুর! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তখন হুজুর বললেন-ভাই কারো কাছে কোনো জিনিস নিলে তখনই মূল্যবান হয় যখন জিনিসটি তার কাছে থাকে না। এই বলে হুজুর গ্রাম্য লোকটিকে বললেন, শোনো! তোমাকে আমি নসীহত করছি যে, তুমি আল্লাহর কাছে এমন একটি জিনিস নিয়ে যাও যেটা আল্লাহর কাছে নেই। তখন তাৎক্ষণিক গ্রাম্য লোকটি হুজুরকে বলল, তা কেমন কথা? কোনো জিনিস আল্লাহর কাছে থাকবে না সেটা তো হতে পারে না। আরে বেটা শোন! অনেক জিনিস এমনও রয়েছে, যা আল্লাহর কাছেও নেই। যেমন-"তাওয়াজু" তথা বিনয় আল্লাহর কাছে নেই। কেননা আল্লাহ পাক হলেন "আকবার" আর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

মানুষ কোনো ফেরেশতা নয় যে, মানুষের কোন গোনাহ হবে না। মানুষ-মানুষ হিসেবে গোনাহ হবেই। তবে কথা হলো সাথে সাথে এর চিকিৎসাও করে নিতে হবে। এর চিকিৎসাটা করতে হবে গোনাহের ধরন হিসেবে। সাধারণভাবে গোনাহ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

(ক) ছগীরা গোনাহ তথা ছোট গোনাহ (খ) কবীরা গোনাহ তথা বড় গোনাহ

এবার মূল কথার দিকে আসা যাক। অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি নিষ্পাপ হওয়ার সর্বোত্তম উপায় কী। মহান আল্লাহ পাক ধাপে ধাপে বর্ণনা করেন। যেমন সগীরা গোনাহের চিকিৎসার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ان الحسنٰت يذهبن السيئات অর্থ : নিশ্চয় নেক কাজসমূহ পাপসমূহকে দূর করে দেয় (৩)। তেমনিভাবে কবীরা গোনাহের চিকিৎসার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা করো।"

(৪) তাওবা করার পদ্ধতি :

তাওবা তিনটি জিনিসের নাম। (ক) গোনাহ স্বীকার করা অর্থাৎ কোন্ অঙ্গ দ্বারা কী কী গোনাহ করেছে তা স্বীকার করে উল্লেখ করা। (খ) অত্যন্ত অনুতাপের সাথে অশ্রু ঝরানো। (গ) ভবিষ্যতে গোনাহ না করার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। কিছু কিছু কবীরা গোনাহের ক্ষেত্রে আরেকটি অতিরিক্ত কাজ করতে হয় তাহলো ক্ষতিপূরণ। যেমন– আমি কোনো জিনিস চুরি করলাম তাহলে সেটা হবে কবীরা গোনাহ। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত তাওবা হওয়ার জন্য উপরোল্লিখিত তিনটি কাজ করার সাথে সাথে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

অর্থাৎ যে জিনিসটি চুরি করেছি তা মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। যদি মালিক না থাকে তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে দিতে হবে। তারাও না থাকলে তার পক্ষ থেকে ছদ্‌কা করে দিতে হবে। এটাই হলো পাপী ব্যক্তি নিষ্পাপ হওয়ার সর্বোত্তম উপায়। এভাবে খাঁটি তাওবা করলে নবজাত শিশুর মতো কোনো গোনাহই থাকবে না ইনশাআল্লাহ। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে,

(৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খবরাখবর

পবিত্র বুখারী শরীফ খতমের উদ্দেশ্যে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)এর উত্তরবঙ্গ সফর

প্রতিবেদক : মাওলানা কারী জসীমুদ্দীন কাসেমী

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং জামিয়া ইসলামিয়া (জামিল মাদরাসা) বগুড়ার মহাপরিচালক বাংলাদেশের শীর্ষ মুরুব্বী ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) গত ১৪ জুন ২০১২ইং বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মাদরাসায় বুখারী খতম ও ইসলাহী ইজতিমার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ওই দিনেই তিনি বাদ মাগরিব শান্তাহার মাদরাসায় বুখারী খতম ও দু'আ করেন। ১৫জুন শুক্রবার জামিল মাদরাসায় বুখারী খতম ও দুআ করেন। জামিল মাদরাসা ঐতিহ্যবাহী একটি কেন্দ্রীয় মাদরাসা। তাতে ছাত্রাবাস অপর্যাপ্ত হওয়া এবং পৃথক একটি শিক্ষাভবন না থাকায় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা.বা.) অনেক আগে থেকেই একটি শিক্ষা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করে আসছিলেন। সে অনুযায়ী গত ১৫/০৬/২০১২ইং শুক্রবার ২০০×৫০ ফুট পাঁচ তলা বিশিষ্ট ৫০ হাজার বর্গফুটের একটি শিক্ষাভবন নির্মান কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করেন এবং দুআ করেন। শিক্ষা ভবনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার জন্য সকলকে দুআ করতে বলেন।

১৬ তারিখ শনিবার তিনি দিনাজপুরের হিলি আনোয়ারুল উলূম মাদরাসা এবং নিউটাউন মাদরাসায় খতমে বুখারী করেন। ১৭ তারিখ রবিবার রংপুর জামিয়া করিমিয়া নূরুল উলূম (জুম্মাপাড়া মাদরাসা) এবং জামিয়া আরবিয়া সৈয়দপুর এ বুখারী খতম এবং দুআ করেন। ১৮ তারিখ সোমবার নন্দিগ্রাম আশরাফুল উলূম উমরপুর মাদরাসায় ইসলাহী বয়ান করেন। এরপর নাটোরের জামিয়া কুরআনিয়ায় ইসলাহী বয়ান করেন।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা. বা.) মর্মান্তিক দূর্ঘটনার কবলেঃ

(বেশ কজন পাঠক মাসিক আল-আবরার দপ্তরে পত্র ও ইমেইল মারফত অনুরোধ করেছেন, হুজুরের বাস্তব অবস্থা ও দূর্ঘটনা সম্পর্কে মাসিক আল-আবরারের মাধ্যমে জানানোর জন্য। এর ভিত্তিতে হুজুরের দূর্ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।)

হুজুর ১৮ জুন ২০১২ইং সকালে নাটোরের জামিয়া কুরআনিয়ায় ইসলামী বয়ান শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দুপুর ২:৪৫ মিনিটের দিকে যমুনা ব্রিজ পার হয়ে টাঙ্গইলের ভূঁয়াপুর নামক স্থানে হুজুরের গাড়ী একটি পিকআপের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়ীগুলো ধুমড়ে-মুচড়ে যায়। হুজুর গুরুতর আহত হন এবং সাথে আরো কয়েকজনের অবস্থাও আশংকাজনক হয়ে পড়ে। স্থানীয় ওলামায়েকেরাম ও মুহিব্বীনগণ খবর পেয়ে দৌড়ে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ হুজুরকে অন্যান্য আহতদেরসহ টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশংকাজনক দেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হুজুর ও আহতদের তড়িৎ ঢাকায় রেফার করে দেন। ওই দিন প্রায় বিকেল ৬টায় হুজুর ও অন্যদেরকে ঢাকার বসুন্ধরাস্থ এ্যাপোলো হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

হাসপাতাল চত্তরের দৃশ্য :

ওই দিন হাসপাতাল চত্তরের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। হুজুরের এম্বুলেন্স দূর থেকে দেখা মাত্রই বহু উলামায়ে কেরাম ও মুহিব্বীন এগিয়ে যান এ্যাম্বুলেন্সের দিকে। হুজুরের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে এক পর্যায়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন উপস্থিত সকলে।

চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবিলম্বে হুজুরকে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেয়। ভর্তির পর পুরো বডি চেকআপ ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা যায় হুজুরের ডান উরুর হাড্ডি ভেঙ্গে গেছে। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত ও রক্তক্ষরণে দূর্বল হয়ে পড়লেও তুলনামূলক আশংকামুক্ত ঘোষণা করেন ডাক্তাররা। হুজুরের চিকিৎসা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া বলেও জানিয়ে দেন তাঁরা।

দূর্ঘটনার খবরে অস্থির মানবতা :

এদিকে হুজুরের দূর্ঘটনার খবর পেয়ে দেশে বিদেশে ওলামায়ে কেরাম, মুহিব্বীন এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টদের মোবইল ও আলাপনী মুহুর্ত মুহুর্ত বেজে উঠা আরম্ভ করে। বর্তমানে হযরতের কি অবস্থা, দূর্ঘটনাটা কোথায় হলো, কিভাবে হলো ইত্যাদি প্রশ্ন সকলের। অপর দিকে বিভিন্ন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ছাত্র শিক্ষকদের নিয়ে দু'আয় নিয়োজিত হয়েছেন বলেও জানান অনেকে। দেশের ওপার তথা ভারত, পাকিস্তান, সৌদী আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, দক্ষিন আফ্রিকা, ইটালী, ফ্রান্স, লণ্ডন, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ওলামায়ে কেরাম, ভক্ত ও পরিচিত জনের ফোনের ধারাবাহিকতাও ছিল আরো আশ্চর্য জনক। কারো কারো কান্নার বিকট আওয়াজ, অনেকের হতাশার অভিব্যক্তির দীর্ঘ আলাপ, বেচাইন হালচাল ফোন রিসিভকারীদের অন্তরকে আরো বিদীর্ণ করে। কেমন যেন এক অমাবস্যা, ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধতার আবেশ বয়ে যায় মারকায ও

(বাকী অংশ ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)